RMDAC

তৃতীয় অধ্যায়
কোষ রসায়ন
CELL CHEMISTRY

প্রধান শব্দসমূহ : কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, অ্যামিনো অ্যাসিড, প্রোটিন, সুকরোজ, এনজাইম।

প্রতিটি জীবদেহ কতগুলো রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। এসব রাসায়নিক উপাদানগুলো কোষনির্ভর। কোষস্থ বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ সম্বন্ধে তোমরা এ অধ্যায়ে জানতে পারবে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে–

- ❖ জীবের রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা।
- ❖ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিডের শ্রেণিবিন্যাস।
- ❖ জীবদেহে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিডের ভূমিকা।
- ❖ উৎসেচক বা এনজাইম এর ক্রিয়ার প্রকৃতি।
- ❖ উৎসেচক এর শ্রেণিবিন্যাস।
- ❖ বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে উৎসেচকের ব্যবহার।

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা
পাঠ ২	মনোস্যাকারাইড বা সরল শর্করা
পাঠ ৩	ডাইস্যাকারাইড
পাঠ ৪	পলিস্যাকারাইড
পাঠ ৫	প্রোটিন বা আমিষ
পাঠ ৬	লিপিড বা স্নেহ পদার্থ
পাঠ ৭	এনজাইম বা উৎসেচক
পাঠ ৮	এনজাইমের কাজের কৌশল বা কর্মপদ্ধতি

জীবকোষের রাসায়নিক উপাদান (Biochemical Components in a Cell)

কোষ হলো জীবদেহের গঠন ও কাজের একক। কোষে জীবন ধারণের সব উপাদান তৈরি হয় এবং বিরাজ করে। উদ্ভিদদেহও বিভিন্ন অজৈব ও জৈব পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। উদ্ভিদের জীবন গঠন ও জীবনধারণের জন্যে বহু রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন হয়। এদের অনেকগুলোই দেহের অভ্যন্তরে তথা কোষাভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানের যে শাখায় কোষস্থ বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক উপাদানগুলোর বর্ণনা, পঠন-পাঠন ও গবেষণা করা হয় তাকে **জৈবরসায়ন বা প্রাণরসায়ন** (Biochemistry) বলা হয়। সজীব উদ্ভিদদেহ বিশ্লেষণ করলে প্রধান যে উপাদান পাওয়া যায় তা হলো পানি। দেহের প্রোটোপ্লাজমের প্রায় শতকরা ৬০–৯০ ভাগ হলো পানি। বাকি যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাকে **কঠিন বস্তু** (solid matters) বলে। ১৭টি মৌল, যেমন– C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, Fe, Na, Cl, Mn, B, S, Mo, Cu ও Zn মিলে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য জৈব উপাদান। জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলোর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, অ্যামিনো অ্যাসিড, প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, অন্যান্য জৈব অ্যাসিড, বিভিন্ন এনজাইম ইত্যাদি প্রধান। অজৈব পদার্থের মধ্যে পানি অন্যতম। সাধারণত দুগ্ধজাত খাদ্য, মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, শস্যদানা, শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে অজৈব লবণ বা খনিজ লবণ বিদ্যমান থাকে।

সকল জীব, বস্তু (matter) দ্বারা গঠিত। বস্তু **রাসায়নিক মৌল** (element) দ্বারা গঠিত। যে বস্তুকে রাসায়নিকভাবে ভেঙ্গে আর কোনো সরল বস্তু পাওয়া যায় না তা হলো **রাসায়নিক মৌল** বা **element**।

জীবনে অত্যাবশ্যকীয় এলিমেন্ট (উপাদান) ৯২টি। ৯২টি এলিমেন্টের মধ্যে জীবের ৯৬% বস্তুই O_2, C, H_2 ও N_2 দ্বারা গঠিত। অন্যান্য এলিমেন্ট Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg অল্প পরিমাণে থাকে।

এলিমেন্টের ক্ষুদ্রতম অংশ যা তার বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে পারে তা হলো atom বা পরমাণু। বস্তু জগতের গঠন একক হলো **এটম** বা **পরমাণু**। এটমের কেন্দ্রস্থলে (নিউক্লিয়াসে) প্রোটন (+) এবং নিউট্রন (o) একসাথে থাকে। নিউক্লিয়াসের বাইরে নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট ইলেকট্রন থাকে। অধিকাংশ এটমে সমসংখ্যক প্রোটন (+) ও ইলেকট্রন (–) থাকে।

কম্পাউন্ড (Compound) বা যৌগ : দুই বা তার অধিক এলিমেন্ট সুনির্দিষ্ট অনুপাতে সংযুক্ত হয়ে একটি কম্পাউন্ড বা যৌগ গঠন করে; যেমন $2H_2 + O_2 = 2H_2O$ অর্থাৎ H_2 এবং O_2 সুনির্দিষ্ট অনুপাতে যুক্ত হয়ে পানি নামক যৌগ গঠন করেছে। একটি কম্পাউন্ডের এটমসমূহ রাসায়নিক বন্ডের (Chemical bond) মাধ্যমে একত্রে সংযুক্ত থাকে।

রাসায়নিক বন্ড (Chemical bond) : রাসায়নিক বন্ড সাধারণত তিন প্রকার ; যথা Ionic (আয়োনিক), Covalent (কোভ্যালেন্ট) বা Hydrogen bond (হাইড্রোজেন বন্ড)।

আয়নিক বন্ড (Ionic bond) : আয়নিক বন্ড প্রতিষ্ঠিত হয় দুটি এটমের মধ্যে। একটি এটম থেকে এক বা একাধিক ইলেক্ট্রন অন্য এটমে স্থানান্তর হয়। প্রথম এটম ইলেক্ট্রন হারিয়ে **পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট** হয় এবং অপরটি ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে **নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট** হয়। এটমের চার্জবিশিষ্ট (+ অথবা –) অবস্থাকে **আয়ন** (ion) বলে। পজিটিভ (+) এবং নেগেটিভ (–) চার্জবিশিষ্ট আয়ন প্রবলভাবে পরস্পরকে আকর্ষণ করে যার ফলে আয়নিক বন্ড তৈরি হয়।

কোভ্যালেন্ট বন্ড (Covalent bond) : দুটি এটমের মধ্যে ইলেকট্রন শেয়ার বা ভাগাভাগি হলে কোভ্যালেন্ট বন্ড সৃষ্টি হয়। দুটি এটমের মধ্যে ইলেক্ট্রন সমানভাগে ভাগাভাগি হলে যে বন্ড তৈরি হয় তা হলো **Nonpolar covalent** বন্ড। ইলেকট্রন দুটি এটমের মধ্যে অসমভাবে ভাগাভাগি হলে যে বন্ড তৈরি হয় তা হলো **Polar covalent** বন্ড।

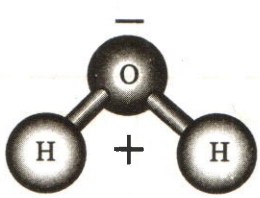

H_2O: একটি পোলার অণু

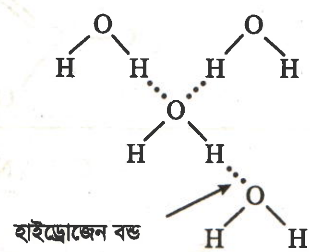

পানির অণুতে হাইড্রোজেন বন্ড

চিত্র ৩.১ : পোলার অণু ও হাইড্রোজেন বন্ড।

হাইড্রোজেন বন্ড (Hydrogen bond) : এক অণুর আংশিক পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট হাইড্রোজেন পরমাণু (atom) এবং অপর অণুর (molecule) আংশিক নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট পরমাণুর মধ্যে **আকর্ষণজনিত শক্তির** (attraction force) কারণে যে বন্ড তৈরি হয় তা হলো হাইড্রোজেন বন্ড।

পেপটাইড বন্ড (Peptide bond) : দুটি অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যকার সৃষ্ট বন্ড। এটি কোভ্যালেন্ট বন্ড।

গ্লাইকোসাইডিক বন্ড (Glycosidic bond) : মনোস্যাকারাইডসমূহের মধ্যকার বন্ড হলো গ্লাইকোসাইডিক বন্ড।

অর্গানিক মলিকিউল বা জৈবঅণু (Organic molecule) : জীবসমূহে বিদ্যমান অধিকাংশ যৌগ কার্বন পরমাণুর একটি কাঠামো নিয়ে গঠিত যার চারপাশে হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে; কখনও কখনও কিছু অন্য মৌলও থাকতে পারে। এ ধরনের অণুকে **জৈবঅণু** বলা হয়। যে অণুতে কোনো কার্বন-হাইড্রোজেন পরমাণু নেই তা হলো **অজৈব যৌগ** (inorganic compound)।

কোনো জৈবঅণুর ক্রিয়াশীল (reactive) গ্রুপকে বলা হয় **Functional Group**। অপর পৃষ্ঠায় কয়েকটি Functional group-এর উদাহরণ দেয়া হলো। Functional group সাধারণত আয়নিক বা পোলার হয়।

Different Functional Groups

Name (নাম)	Structure (গঠন)	Molecule Class (অণু শ্রেণি)	Example (উদাহরণ)
Hydroxyl	— C — OH	Alcohol	Ethyl Alcohol
Carbonyl	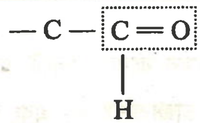 or 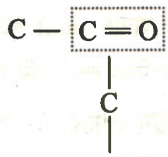	Aldehyde Ketone	Acetaldehyde Acetone
Carboxyl	— C — COOH or 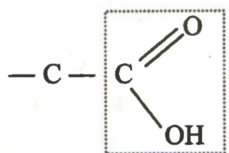	Oranic acid	Acetic acid
Amino	— C — NH_2 or 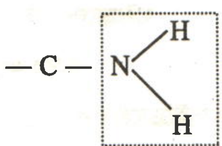	Amino acid	Alanine
Phosphate	— C — PO_4^{2-} or 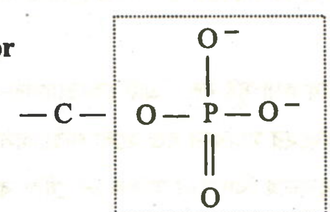	Nucleotide Nucleic acid	Glyceraldehyde-3-Phosphate
Sulfhydril	— C — SH	many cellular molecules	Mercatoethanol

পৃথিবীতে বিরাজমান সকল জীবের নিয়ন্ত্রক হলো জৈবঅণু, যেমন– কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড এবং নিউক্লিক অ্যাসিড। নিচে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

RMDAC

কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates) বা শর্করা

জীবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ গাঠনিক উপাদান ও সঞ্চয়ী উপাদান হলো কার্বোহাইড্রেট। আমাদের খাদ্য তালিকার প্রধান উপাদানও কার্বোহাইড্রেট।

কার্বোহাইড্রেট কী? সাধারণভাবে, কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগকে **কার্বোহাইড্রেট** বলে; যেখানে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত ১ ঃ ২ ঃ ১। যেমন- গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$)। তবে অনেক যৌগ আছে যেখানে এমন অনুপাত না থাকলেও সেটা কার্বোহাইড্রেট; যেমন- সুক্রোজ ($C_{12}H_{22}O_{11}$)। আবার এমন অনুপাত থাকলেও সেটা কার্বোহাইড্রেট নয়; যেমন- ফরম্যালডিহাইড (HCHO), অ্যাসিটিক অ্যাসিড (CH_3COOH) ইত্যাদি। আধুনিক ধারণা অনুসারে নাইট্রোজেন বা সালফার সমৃদ্ধ সামান্য কিছু যৌগকেও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কারণে কার্বোহাইড্রেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাই বর্তমান ধারণা অনুযায়ী, **যে সকল অ্যালডিহাইড বা কিটোন জাতীয় যৌগে কতগুলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকে অথবা যারা আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে কতগুলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপযুক্ত অ্যালডিহাইড বা কিটোন উৎপন্ন করে সেসব যৌগকে কার্বোহাইড্রেট বলে।** কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড বা পলিহাইড্রক্সি কিটোন অথবা এদের derivatives (উদ্ভূত যৌগসমূহ)।

'হাইড্রেট্স অব কার্বন' থেকে কার্বোহাইড্রেট নামকরণ হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় 'কার্বনের জলায়ন' অর্থাৎ এক অণু পানির সাথে এক অণু কার্বন (CH_2O) এ অনুপাতে গঠিত বিভিন্ন প্রকার যৌগ (Diverse compounds based on the general formula CH_2O are carbohydrates)। এ সাধারণ ফর্মুলাটি কেবলমাত্র মনোস্যাকারাইড্স-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (যেমন গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ইত্যাদি)। একাধিক মনোস্যাকারাইড সহযোগে যেসব কার্বোহাইড্রেট গঠিত হয় ঐ সব ক্ষেত্রে এই সাধারণ ফর্মুলা প্রযোজ্য নয়। যখন এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু ফ্রুক্টোজ গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনীর মাধ্যমে একত্র হয়ে এক অণু সুকরোজ গঠন করে তখন এ সাধারণ ফর্মুলা কার্যকরী হয় না, কারণ বন্ধনী সৃষ্টিকালে এক অণু পানি (H_2O) বের হয়ে যায়, তাই সুকরোজ-এর ফর্মুলা দাঁড়ায় $C_{12}H_{22}O_{11}$। অধিকাংশ উদ্ভিদের শুকনো ওজনের ৫০–৮০ ভাগ কার্বোহাইড্রেট থাকে। সারা বিশ্বে সকল জৈব বস্তুর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় যা জীবদেহে গাঠনিক উপাদান ও সঞ্চয়ী উপাদান হিসেবে থাকে।

কার্বোহাইড্রেটের উৎস : প্রধান উৎস হলো উদ্ভিদ। উচ্চশ্রেণির প্রাণিদেহে সামান্য পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট থাকে। উদ্ভিদের কাণ্ড, বাকল, আঁশ, ফল-মূল, বীজ, রস ইত্যাদিতে সেলুলোজ ও স্টার্চরূপে কার্বোহাইড্রেট থাকে। প্রাণিদেহের যকৃত, পেশি ও দুধে যথাক্রমে গ্লাইকোজেন, ল্যাকটিক অ্যাসিড ও ল্যাকটোজেনরূপে কার্বোহাইড্রেট সঞ্চিত থাকে।

কার্বোহাইড্রেটের (শর্করার) বৈশিষ্ট্য

১। এটি দানাদার (চিনি), তন্তুময় (সেলুলোজ) বা পাউডারজাতীয় পদার্থ।
২। এরা স্বাদে মিষ্টি (সুক্রোজ) বা স্বাদহীন (সেলুলোজ)।
৩। বেশি তাপ প্রয়োগে অঙ্গারে পরিণত হয়।
৪। অধিকাংশই পানিতে অদ্রবণীয় তবে মনোস্যাকারাইড পানিতে দ্রবণীয়।
৫। অ্যাসিডের সাথে মিশে এস্টার গঠন করে।
৬। এরা আলোক সক্রিয় ও আলোক সমাণুতা প্রদর্শন করে।

জীবদেহে কার্বোহাইড্রেট-এর কাজ : নিচে কার্বোহাইড্রেট-এর কাজ উল্লেখ করা হলো।

১। জীবদেহের শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে এবং জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে।
২। উদ্ভিদের সাপোর্টিং টিস্যুর গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।
৩। উদ্ভিদদেহ গঠনকারী পদার্থগুলোর কার্বন কাঠামো (carbon skeleton) প্রদান করে।
৪। প্রাণিদেহে হাড়ের সন্ধিস্থলে লুব্রিকেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৫। উদ্ভিদদেহে সঞ্চয়ী পদার্থ হিসেবে বিরাজ করে।
৬। ক্যালভিন চক্র, ক্রেবস্ চক্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ চক্রে কার্বোহাইড্রেট সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

৭। বিভিন্ন প্রকার কো-এনজাইমের গাঠনিক অংশ হিসেবে থাকে। যেমন-ATP, NADP, FAD ইত্যাদি।
৮। ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যামিনো অ্যাসিড বিপাকে সাহায্য করে।
৯। সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, কাইটিন, পেকটিন ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেট কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান।
১০। নিউক্লিক অ্যাসিডের অন্যতম উপাদান রাইবোজ ও ডিঅক্সিরাইবোজ হলো পেন্টোজজাতীয় কার্বোহাইড্রেট।
১১। প্রাণী, ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া গ্লাইকোজেন নামক কার্বোহাইড্রেট সঞ্চয় করে।
১২। আমাদের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় এর অনেক উপাদান কার্বোহাইড্রেট থেকে আসে।
১৩। সেলুলোজজাতীয় কার্বোহাইড্রেট উদ্ভিদকে দৃঢ়তা ও সুরক্ষা প্রদান করে।

কার্বোহাইড্রেট-এর শ্রেণিবিভাগ

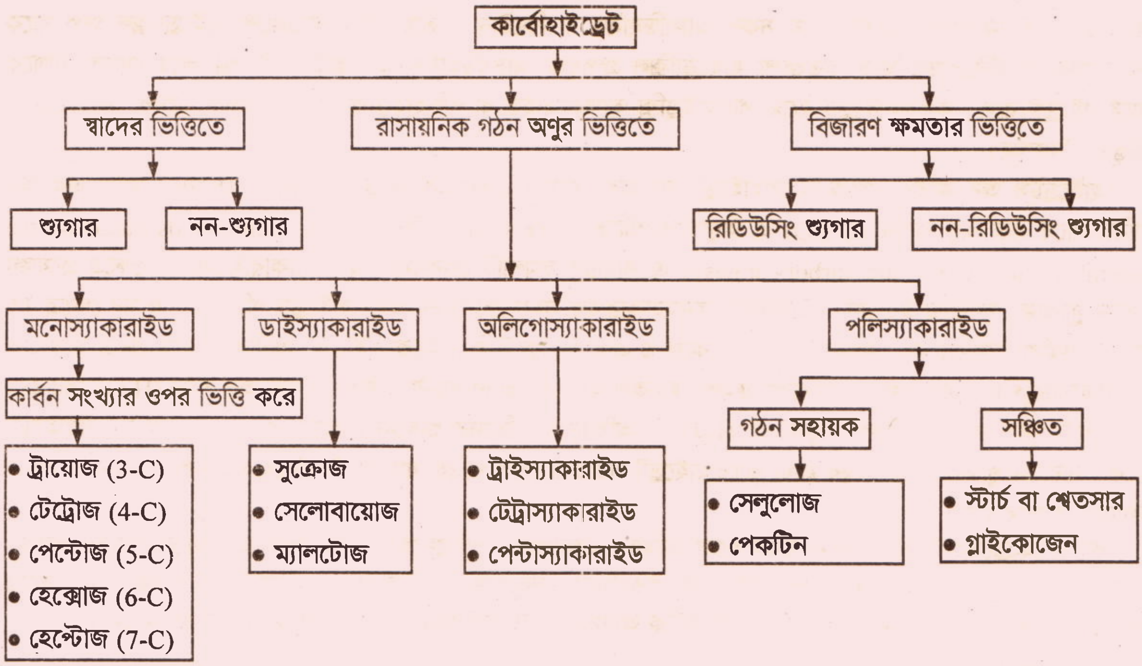

নিচে বিভিন্ন ধরনের কার্বোহাইড্রেটের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো :

(ক) স্বাদের ওপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেট দু' প্রকার; যথা- (১) **শ্যুগার** : এরা স্বাদে মিষ্টি, দানাদার এবং পানিতে দ্রবণীয়, যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ ইত্যাদি; (২) **নন-শ্যুগার** : এরা স্বাদে মিষ্ট নয়, অদানাদার এবং পানিতে অদ্রবণীয়, যেমন- স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন ইত্যাদি।

(খ) রাসায়নিক গঠন অণুর ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত চার শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো– ১। মনোস্যাকারাইড (Monosaccharides); ২। ডাইস্যাকারাইড (Disaccharides); ৩। অলিগোস্যাকারাইড (Oligosaccharides) এবং ৪। পলিস্যাকারাইড (Polysaccharides)। নিম্নে রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করা হলো।

১। মনোস্যাকারাইড (Monosaccharides; গ্রিক *mono* = এক এবং *saccharin* = sugar বা চিনি) : যে কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রোলাইসিস করলে আর কোনো সরল কার্বোহাইড্রেট একক পাওয়া যায় না সেগুলোই **মনোস্যাকারাইড**। মনোস্যাকারাইড অন্যান্য জটিল কার্বোহাইড্রেট তৈরির গাঠনিক ইউনিট (building unit) হিসেবে কাজ করে। এর সাধারণ সংকেত হচ্ছে $C_nH_{2n}O_n$। মনোস্যাকারাইডসমূহে একটি মুক্ত অ্যালডিহাইড গ্রুপ (–CHO) বা কিটোন গ্রুপ (–CO–) এবং একাধিক হাইড্রোক্সিল (–OH) গ্রুপ থাকে। মনোস্যাকারাইডে কার্বনের সংখ্যা ৩–১০। কার্বনের সংখ্যা অনুযায়ী মনোস্যাকারাইডকে তিন কার্বনবিশিষ্ট ট্রায়োজ (triose), চার কার্বনবিশিষ্ট টেট্রোজ (tetrose), পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট

পেন্টোজ (pentose), ছয় কার্বনবিশিষ্ট হেক্সোজ (hexose), সাত কার্বনবিশিষ্ট হেপ্টোজ (Heptose) ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়। জীবদেহের অধিকাংশ মনোস্যাকারাইড অপ্টিক্যাল আইসোমারের D সিরিজভুক্ত।

মনোস্যাকারাইডগুলোতে অ্যালডিহাইড গ্রুপ (–CHO) বা কিটোন গ্রুপ (>C=O) মুক্তভাবে থাকায় এরা বিজারক (reducing) পদার্থ হিসেবে কাজ করে। কাজেই –CHO বা, >C=O গ্রুপযুক্ত কার্বোহাইড্রেটকে **রিডিউসিং শ্যুগার** (reducing sugar) বলা হয়। বেনেডিক্ট দ্রবণের $Cu(OH)_2$ (কিউপ্রিক হাইড্রোক্সাইড) উক্ত শ্যুগারের –CHO বা, C = O গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া করে কিউপ্রাস অক্সাইড-এ (Cu_2O) পরিণত হয়, যা লাল বর্ণের অধঃক্ষেপ হিসেবে জমা হয়। রিডিউসিং শ্যুগার পরীক্ষা করতে তাই এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। মনোস্যাকারাইডসমূহ সাধারণত মিষ্টি স্বাদবিশিষ্ট।

(i) ট্রায়োজ (triose, $C_3H_6O_3$) : তিন কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় **ট্রায়োজ**। **গ্লিসার্যাল্ডিহাইড** এবং **ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন** হলো দুটি সরল ট্রায়োজ। এরা দ্রবণীয় মনোস্যাকারাইড। উদ্ভিদে এরা ফসফেট এস্টার হিসেবে কাজ করে। গ্লিসার্যাল্ডিহাইড-এর ১নং কার্বনে একটি কার্বনাইল অক্সিজেন যুক্ত হয়ে একে **অ্যালডিহাইড** গ্রুপ নির্দেশ করে এবং ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোনের ২নং কার্বনে কার্বনাইল অক্সিজেন যুক্ত হয়ে একে **কিটোন গ্রুপ** নির্দেশ করে। কাজেই গ্লিসার্যাল্ডিহাইড হলো একটি **অ্যালডোজ** (aldose) শর্করা এবং ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন হলো একটি **কিটোজ** (ketose) শর্করা। অ্যালডিহাইড এবং কিটোন গ্রুপকে বলা হয় **রিডিউসিং গ্রুপ** (reducing group) কারণ এরা সহজেই কতিপয় যৌগের সাথে জারিত (oxidation) হয়ে যায় এবং ঐ যৌগ বিজারিত (reduction) হয়। তাই অ্যালডিহাইড ও কিটোন গ্রুপযুক্ত চিনিকে বলা হয় **রিডিউসিং শ্যুগার** (reducing sugar) বা **বিজারক শর্করা**।

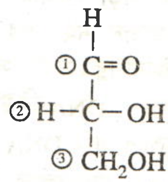
গ্লিসার্যাল্ডিহাইড (অ্যালডোজ)

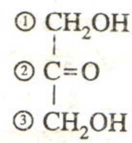
ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন (কিটোজ)

(ii) টেট্রোজ (tetrose, $C_4H_8O_4$) : চার কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় **টেট্রোজ**। **ইরিথ্রোজ** (erythrose) হলো একটি অ্যালডোজ শর্করা এবং ইরিথ্রোলোজ হলো একটি কিটোজ শর্করা। উদ্ভিদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি ইরিথ্রোজ-4 ফসফেট হিসেবে বিরাজ করে। ক্যালভিন চক্রে এর ভূমিকা আছে।

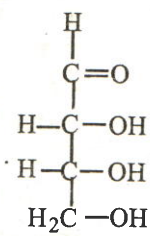
D- ইরিথ্রোজ

(iii) পেন্টোজ (pentose, $C_5H_{10}O_5$) : পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় পেন্টোজ। জাইলোজ, রাইবোজ, ডিঅক্সিরাইবোজ ও অ্যারাবিনোজ হলো অ্যালডোজ শর্করা এবং রাইবুলোজ ও জাইলুলোজ হলো কিটোজ শর্করা।

■ **রাইবোজ (ribose) :** এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট পেন্টোজ শ্যুগার। ১৮৯১ সালে Emil Fisher এটি আবিষ্কার করেন। এটি রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের (RNA) একটি গঠন একক। এর আণবিক সংকেত $C_5H_{10}O_5$। এতে একটি (–CHO) গ্রুপ থাকায় এদের **অ্যালডোপেন্টোজ** বলা হয়। রাইবোজ শর্করার গলনাঙ্ক ৯৫° সে., গাঢ় HCl এর সাথে বিক্রিয়া করে ফারফিউরাল অ্যাসিড উৎপন্ন করে। RNA-তে কেবলমাত্র রাইবোজ শ্যুগারই নিউক্লিওটাইড বা নিউক্লিওসাইড তৈরিতে অংশগ্রহণ করে। এটি নির্দিষ্ট পিউরিন বা পাইরিমিডিন বেস এর সাথে যুক্ত হয়ে একটি নিউক্লিওসাইড উৎপন্ন করে। নিউক্লিওসাইডের সাথে একটি অজৈব ফসফেট যুক্ত হয়ে **নিউক্লিওটাইডে** পরিণত হয়। কার্বন বিজারণের মাধ্যমে শর্করা তৈরি প্রক্রিয়াতেও রাইবোজ ভূমিকা পালন করে। ATP, NAD+, NADP+, FAD, Co-A ইত্যাদি জৈব-অণুর সাথেও রাইবোজ যুক্ত থাকে। রাইবোজ বিজারণ ক্ষমতাসম্পন্ন।

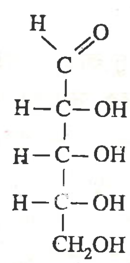
D-রাইবোজ (চেইন স্ট্রাকচার)

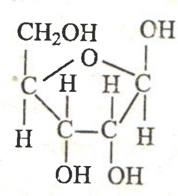
D-রাইবোজ (রিং স্ট্রাকচার)

(MAT: 23-24)

■ **ডিঅক্সিরাইবোজ (deoxyribose) :** ডিঅক্সিরাইবোজ আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পেন্টোজ শ্যুগার। এর আণবিক সংকেত $C_5H_{10}O_4$। এতে একটি অ্যালডিহাইড (–CHO) গ্রুপ (বিজারণ ক্ষমতাসম্পন্ন) থাকায় একে **ডিঅক্সি-অ্যালডোপেন্টোজও** বলে। এটি রাইবোজ শ্যুগার-এর মতোই, পার্থক্য শুধু এই যে, এর ২নং কার্বনে –OH গ্রুপের পরিবর্তে কেবল একটি হাইড্রোজেন (H) পরমাণু আছে। ডিঅক্সি অর্থ হলো অক্সিজেন ছাড়া (without oxygen) অর্থাৎ ২নং কার্বনে কোনো অক্সিজেন নেই। এর ১নং কার্বন অবস্থানে যেকোনো একটি পিউরিন বা পাইরিমিডিন বেস (A, T, G, C) যুক্ত হলে একটি ডিঅক্সিনিউক্লিওসাইড সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় ৫নং কার্বন অবস্থানে অজৈব ফসফেট যুক্ত হলে একটি ডিঅক্সিনিউক্লিওটাইড সৃষ্টি হয়। DNA-নিউক্লিক অ্যাসিডের নিউক্লিওটাইড গঠনের অংশ হিসেবে বিরাজ করে ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার। এ শ্যুগার ছাড়া DNA গঠন সম্ভব নয়। ডিঅক্সিরাইবোজ বিজারণ ক্ষমতাসম্পন্ন।

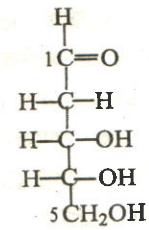
D-2, ডিঅক্সিরাইবোজ (চেইন স্ট্রাকচার)

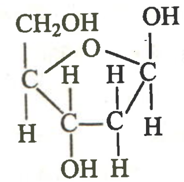
β-D-2, ডিঅক্সিরাইবোজ (রিং স্ট্রাকচার)

■ **রাইবুলোজ (ribulose) :** রাইবুলোজ হলো একধরনের পেন্টোজ মনোস্যাকারাইড। এর আণবিক গঠনে একটি কিটোগ্রুপ (>C=O) রয়েছে। তাই একে **কিটোপেন্টোজও** বলে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় রাইবুলোজ হতে তৈরি হয় রাইবুলোজ ১,৫-ডাইফসফেট। এটি সালোকসংশ্লেষণে CO_2 গ্রাহক হিসেবে কাজ করে। এটি পরে বিজারিত হয়ে একটি কার্বোক্সিল যৌগ গঠন করে যা সাথে সাথে ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডের দুটি অণু প্রদান করে।

রাইবোজ ও ডিঅক্সিরাইবোজ এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	রাইবোজ	ডিঅক্সিরাইবোজ
১। অপরিহার্যতা	এটি হলো RNA এর অপরিহার্য উপাদান।	এটি হলো DNA এর অপরিহার্য উপাদান।
২। HCl-এর সাথে বিক্রিয়া	গাঢ় HCl অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ফারফিউরাল অ্যাসিড তৈরি করে।	গাঢ় HCl অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লেভুলিনিক অ্যাসিড তৈরি করে।
৩। অক্সিজেন পরমাণু	আণবিক গঠনে ৫টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে।	আণবিক গঠনে ৪টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে।
৪। –OH গ্রুপ	২নং কার্বন পরমাণুর সাথে –OH গ্রুপ যুক্ত থাকে।	২নং কার্বন পরমাণুর সাথে কেবল H যুক্ত থাকে।
৫। অংশগ্রহণ	নিউক্লিওটাইড ও শর্করা তৈরিতে অংশগ্রহণ করে।	ডিঅক্সিনিউক্লিওটাইড গঠনে অংশগ্রহণ করে।

(iv) **হেক্সোজ (hexose, $C_6H_{12}O_6$) :** ৬ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় **হেক্সোজ**। গ্লুকোজ, ম্যানোজ, গ্যালাক্টোজ হলো অ্যালডোজ শর্করা এবং ফ্রুক্টোজ হলো একটি কিটোজ শর্করা। এরা উদ্ভিদকোষে মুক্ত অবস্থায় অথবা অন্য জটিল কার্বোহাইড্রেট-এর অংশ হিসেবে বিরাজ করে। সাধারণত গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজকে মুক্ত অবস্থায় সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

■ **গ্লুকোজ (Glucose) :** গ্লুকোজ বা ডেক্সট্রোজ একটি উল্লেখযোগ্য মনোস্যাকারাইড। উদ্ভিদকোষে দ্রবণীয় অবস্থায় একে পাওয়া যায়। এর আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। এটি একটি অ্যালডোহেক্সোজ কারণ এতে অ্যালডিহাইড গ্রুপ (– CHO) আছে। এটি একটি রিডিউসিং শ্যুগার বা বিজারণক্ষম শর্করা। [MAT : 16-17]

বিভিন্ন প্রকার পাকা ফল ও মধুতে প্রচুর গ্লুকোজ থাকে। পাকা আঙ্গুরে গ্লুকোজের পরিমাণ শতকরা ১২–৩০ ভাগ। একে অনেক সময় **গ্রেইপ শ্যুগার** (grape sugar) বা **আঙ্গুরের শর্করা** বলা হয়। উদ্ভিদে গ্লুকোজ কখনো সঞ্চিত পদার্থ হিসেবে বিরাজ করে না। শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ হলো গ্লুকোজ। [MAT : 18-19]

উৎপাদন ও প্রস্তুত প্রণালি : প্রকৃতিতে সবুজ উদ্ভিদ থেকে গ্লুকোজ উৎপাদিত হয়। আবার গবেষণাগারে হাইড্রোলাইসিস করে সুক্রোজ ও স্টার্চ থেকে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ প্রস্তুত করা যায়।

বৈশিষ্ট্য : গ্লুকোজ সাদা দানাদার পদার্থ। স্বাদে মিষ্টি এবং পানিতে সহজেই দ্রবণীয়। এটি অ্যালকোহলে সামান্য দ্রবণীয় কিন্তু ইথারে অদ্রবণীয়।

গ্লুকোজের ব্যবহার : (i) রোগীর পথ্য হিসেবে গ্লুকোজ-এর বহুল ব্যবহার প্রচলিত। (ii) এটি রোগীকে দ্রুত শক্তি যোগায়। (iii) বিভিন্ন ফল সংরক্ষণে গ্লুকোজ ব্যবহার করা হয়। (iv) ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট হিসেবে ওষুধ শিল্পে গ্লুকোজ

ব্যবহৃত হয়। (v) ভিটামিন 'সি' তৈরি করার জন্য গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়। (vi) গ্লুকোজ সরবিটল তৈরি ও গ্লাইকোলাইসিসে ব্যবহৃত হয়। (vii) গ্লুকোজ কার্বোহাইড্রেট বিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ্লুকোজের রিং স্ট্রাক্চার এবং α/ß-D গ্লুকোজ : গ্লুকোজের ১নং কার্বন এবং ৫নং কার্বন কাছাকাছি এলে (দ্রবণে সাধারণত কাছাকাছি আসে) এদের মধ্যে একটি অক্সিজেন সেতু তৈরি হয়। এর ফলে ১নং কার্বনে একটি –OH গ্রুপ সৃষ্টি হয়। নতুন সৃষ্ট এই –OH গ্রুপ ১নং কার্বনের α (আলফা) অথবা ß (বিটা) অবস্থানে থাকতে পারে। –OH গ্রুপের এই α এবং ß অবস্থানের কারণে গ্লুকোজের ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে; যেমন– ß-গ্লুকোজ গঠন করে **সেলুলোজ**, কিন্তু α-গ্লুকোজ গঠন করে **স্টার্চ**। সেলুলোজ কোষের গাঠনিক বস্তু এবং স্টার্চ কোষের সঞ্চয়ী খাদ্য বস্তু।

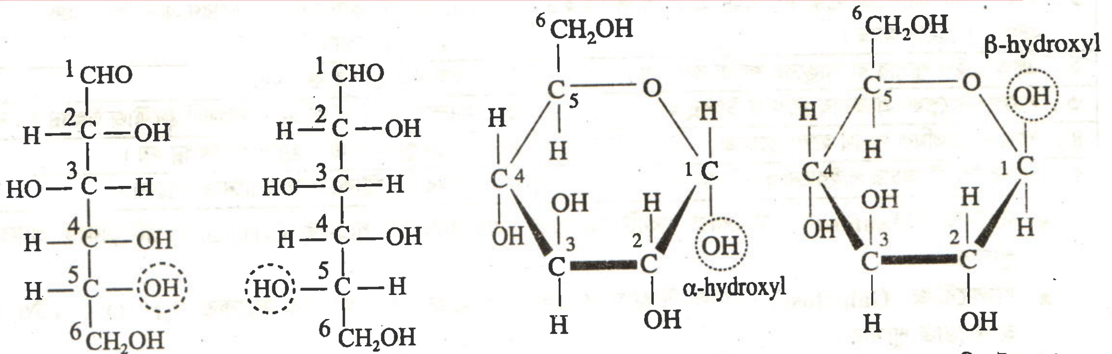

D-গ্লুকোজ (চেইন স্ট্রাকচার) L-গ্লুকোজ (চেইন স্ট্রাকচার) α-D-গ্লুকোজ (রিং স্ট্রাকচার) ß-D-গ্লুকোজ (রিং স্ট্রাকচার)

D এবং L গ্লুকোজ : গ্লুকোজের ৫নং কার্বনে সংযুক্ত (–OH) মূলক ডানদিকে থাকলে তাকে বলা হয় D-গ্লুকোজ। ৫নং কার্বনে সংযুক্ত (–OH) মূলক বামদিকে থাকলে তাকে বলা হয় L-গ্লুকোজ। D-গ্লুকোজ **দক্ষিণাবর্ত** (dextrorotatory) হয় যাকে d বা '+' চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়। L-গ্লুকোজ **বামাবর্ত** (laevorotatory) হয় যাকে *l* বা '–' চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়। দক্ষিণাবর্ত অর্থ হলো যৌগটি আলোক সক্রিয় এবং ঘূর্ণনের দিক **'ডান'**; বামাবর্ত অর্থ হলো যৌগটি আলোক সক্রিয় এবং ঘূর্ণনের দিক **'বাম'**। গ্লুকোজের d বা *l* ফর্ম optical rotation ছাড়া অন্য সকল ভৌত বৈশিষ্ট্য একই প্রকার। **উদ্ভিদে সবসময়ই D-গ্লুকোজ থাকে।**

■ **ফ্রুক্টোজ (Fructose) :** গ্লুকোজের ন্যায় ফ্রুক্টোজও ৬ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইড। এর আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$ (গ্লুকোজের মতোই)। এটিও একটি রিডিউসিং শ্যুগার বা বিজারণক্ষম শর্করা। এর গঠনে রয়েছে একটি কিটো গ্রুপ (>C = O)। একে কিটোহেক্সোজও বলা হয়। অধিকাংশ পাকা মিষ্টি ফল ও মধুতে ফ্রুক্টোজ থাকে। তাই এর আরেক নাম **ফলের চিনি** বা **ফ্রুট শ্যুগার** (fruit sugar)। গ্লুকোজ থেকে সহজেই ফ্রুক্টোজ তৈরি হয় আবার সুকরোজ হাইড্রোলাইসিস-এর ফলেও ফ্রুক্টোজ তৈরি হয়। এটি সুকরোজ এর একটি গঠন উপাদান। গ্লুকোজের মতো ফ্রুক্টোজও D এবং L দু'প্রকার আছে। প্রথম ফ্রুট তথা ফল থেকে শনাক্ত করা হয়েছিল বলে নাম করা হয় ফ্রুক্টোজ। ফ্রুক্টোজ সমপরিমাণ গ্লুকোজের সাথে যুক্ত হয়ে চিনি গঠন করে। তাই একে বীট ও আখের কাণ্ড রসে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

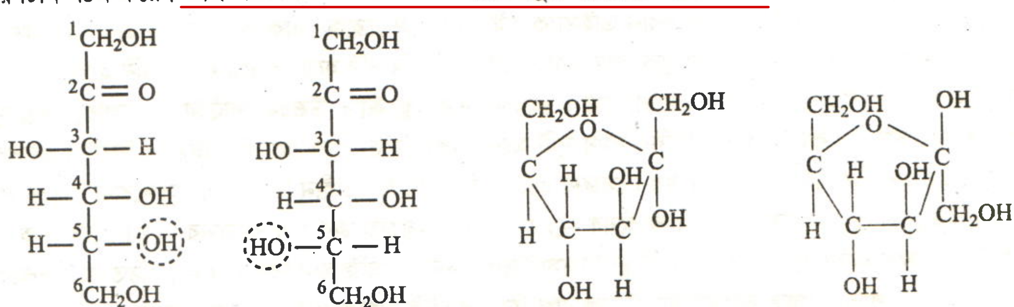

D–ফ্রুক্টোজ (চেইন স্ট্রাকচার) L–ফ্রুক্টোজ (চেইন স্ট্রাকচার) α–D–ফ্রুক্টোজ (রিং স্ট্রাকচার) ß–D–ফ্রুক্টোজ (রিং স্ট্রাকচার)

RMDAC

বৈশিষ্ট্য : এটি একটি সাদা বর্ণের, দানাদার, স্ফটিকাকার ও মিষ্টিজাতীয় পদার্থ। পানিতে সহজেই দ্রবণীয়। গরম অ্যালকোহলেও দ্রবণীয়। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের আণবিক সংকেত এক হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। তাই এদেরকে আইসোমার বলে।

ব্যবহার : (i) কনফেকশনারিতে নানা ধরনের মিষ্টান্নজাতীয় জিনিস প্রস্তুত করার জন্য ফ্রুক্টোজ ব্যবহার করা হয়।
(ii) সুক্রোজকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে সমপরিমাণে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ তৈরি হয়।

Reading

গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ এর মধ্যে পার্থক্য

গ্লুকোজ	ফ্রুক্টোজ
১। এটি একটি অ্যালডোহেক্সোজ; কারণ এতে অ্যালডিহাইড গ্রুপ (-CHO) আছে।	১। এটি একটি কিটোহেক্সোজ; কারণ এতে কিটো গ্রুপ (<C = O) আছে।
২। একে গ্রেইপ শ্যুগার বা আঙুরের শর্করা বলা হয়।	২। একে ফ্রুট শ্যুগার বলা হয়।
৩। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়।	৩। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি ফ্রুক্টোজ উৎপন্ন হয় না।
৪। শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ হলো গ্লুকোজ।	৪। শ্বসনে গ্লুকোজ হতে ফ্রুক্টোজ উৎপন্ন হয়।
৫। এদের রিং স্ট্রাকচার পাইরানোজ ধরনের।	৫। এদের রিং স্ট্রাকচার ফিউরানোজ ধরনের।

- **ম্যানোজ (Mannose)** : ম্যানোজ একটি হেক্সোজ। এর আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। এটি একটি অ্যালডোজ শ্যুগার।
- **গ্যালাক্টোজ (Galactose)** : গ্যালাক্টোজ আর একটি হেক্সোজ। এর আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। এটিও একটি অ্যালডোজ শ্যুগার।

গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ম্যানোজ, গ্যালাক্টোজ হলো গাঠনিক আইসোমার। এদের সবার গাঠনিক ফর্মুলা $C_6H_{12}O_6$ কিন্তু এদের এটমিক বিন্যাস ভিন্ন।

আপেক্ষিক মিষ্টতা : সুক্রোজ-১০০; গ্লুকোজ-৭৪; ফ্রুক্টোজ-১৭৩; মল্টোজ- ৩২; ল্যাক্টোজ- ১৬; স্যাকারিন- ৫০০; মন্যালেলিন- ২০০০।

(v) হেপ্টোজ (heptose, $C_7H_{14}O_7$) : সাত কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় **হেপ্টোজ**। সেডোহেপ্টোলোজ হলো একটি অ্যালডোজ শর্করা।

২। ডাইস্যাকারাইড (Disaccharide; গ্রিক *di* = দুই এবং *saccharin* = চিনি) : দুটি মনোস্যাকারাইড একত্রে যুক্ত হয়ে যে কার্বোহাইড্রেট গঠন করে তাকে **ডাইস্যাকারাইড** বলে। সুক্রোজ, সেলোবায়োজ, ম্যালটোজ, ল্যাক্টোজ ইত্যাদি হলো উল্লেখযোগ্য ডাইস্যাকারাইড। ডাইস্যাকারাইডের সাধারণ সংকেত হলো $C_{12}H_{22}O_{11}$।

সুক্রোজ → গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ; ম্যালটোজ → গ্লুকোজ + গ্লুকোজ; ল্যাকটোজ → গ্লুকোজ + গ্যালাক্টোজ

দুই অণু মনোস্যাকারাইডের মধ্যে ঘনীভবন বিক্রিয়ার ফলে দুটো –OH মূলক থেকে এক অণু পানি অপসারিত হলে ডাইস্যাকারাইড উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন ডাইস্যাকারাইড অণুতে উভয় মনোস্যাকারাইডের C–O–C নতুন বন্ধন সৃষ্টি করে। সৃষ্ট বন্ধনকে (–O–) **গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী** (Glycosidic bond) বলে। [DAT: 19-20, 17-18]

(i) সুক্রোজ (Sucrose) : **উদ্ভিদের প্রধান ডাইস্যাকারাইড হলো সুক্রোজ।** এক অণু গ্লুকোজ এবং এক অণু ফ্রুক্টোজ এক সাথে সংযুক্ত হয়ে গঠন করে এক অণু সুক্রোজ। এতে এক অণু পানি সৃষ্টি হয়ে বেরিয়ে যায়। চিনি হলো একটি সাধারণ সুকরোজ। ইক্ষু এবং বীট থেকে চিনি পাওয়া যায়। **গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ উভয়ই রিডিউসিং শ্যুগার, কিন্তু সুক্রোজ রিডিউসিং শ্যুগার নয়।** কারণ সুক্রোজ তৈরির সময় দুটি মনোস্যাকারাইডের মুক্ত অ্যালডিহাইড ও কিটোন গ্রুপের অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এর বিজারণ ক্ষমতা লুপ্ত হয়। সেজন্য এটিকে বিজারণ ক্ষমতাহীন চিনি বলে। সুক্রোজ তৈরির সময় দুটি মনোস্যাকারাইড তথা α-D-গ্লুকোজের ১নং কার্বনের –OH এবং β-D-ফ্রুক্টোজের ২নং কার্বনের –OH থেকে এক অণু পানি অপসারিত হয়। ফলে কার্বন দুটির মধ্যে একটি গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী বা অক্সিজেন ব্রিজ (–O–) গঠিত হয়ে সুক্রোজ সৃষ্টি হয়। সবুজ উদ্ভিদের **পাতায় প্রস্তুত কার্বোহাইড্রেট সুক্রোজ হিসেবে বিভিন্ন অঙ্গে পরিবাহিত হয়।** মধুর প্রধান কাঁচামাল হলো সুক্রোজ। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$।

উৎপাদন প্রণালি : ইক্ষুর রসে প্রায় ১৫% সুকরোজ, কিছু পরিমাণ জৈব অ্যাসিড, প্রোটিন ও ফসফেটজাতীয় পদার্থ বিদ্যমান। সংগৃহীত রসকে পরিস্রুত করার পর তার সাথে কলিচুন মিশানো হয়। তার ফলে দ্রবণ থেকে অ্যাসিড প্রশমিত হয়, ফসফেট অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং চিনির আর্দ্র-বিশ্লেষণ বন্ধ হয়। অতঃপর রসকে উত্তপ্ত করলে বেশির ভাগ ভেজাল ফেনা ও অধঃক্ষেপ আকারে আলাদা হয়ে যায়। পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত পরিষ্কার রসকে নিম্নচাপে ঘনীভূত করলে সুকরোজ এর স্ফটিক (চিনি) পাওয়া যায়।

বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম : সুকরোজ সাদা দানাদার, মিষ্টি স্বাদযুক্ত কঠিন পদার্থ। স্বাদে গ্লুকোজ থেকে দ্বিগুণ মিষ্টি, পানিতে দ্রবণীয়, কিন্তু বিশুদ্ধ অ্যালকোহল ও ইথারে অদ্রবণীয়। এর গলনাঙ্ক ১৮৮° সেলসিয়াস। লঘু অ্যাসিডে সুকরোজের জলীয় দ্রবণ আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে সমপরিমাণ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ অণু গঠন করে।

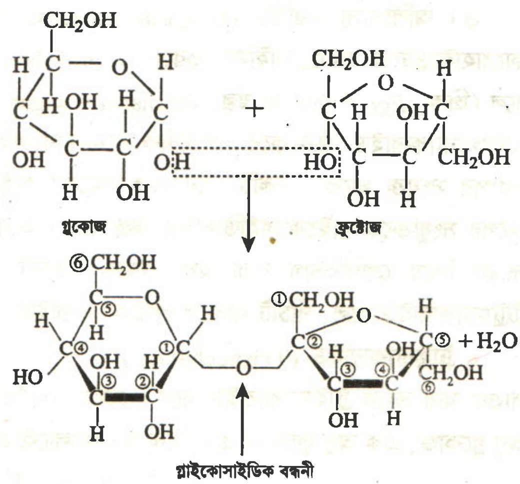

সুক্রোজ-এর গঠন

$$\underset{\text{সুক্রোজ}}{C_{12}H_{22}O_{11}} + H_2O \xrightarrow{\text{আর্দ্রবিশ্লেষণ}} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{ফ্রুক্টোজ}}{C_6H_{12}O_6}$$

কাজ : শ্বসনের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে। কোষের বিভিন্ন উপাদান, বিশেষ করে পলিস্যাকারাইড সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার : বিভিন্ন মিষ্টান্ন তৈরিতে ব্যবহার হয়। কনফেকশনারিতে ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষাগারে অক্সালিক অ্যাসিড প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত হয়। স্বচ্ছ সাবান তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

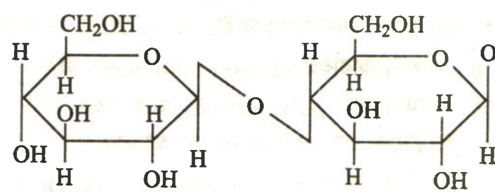
সেলোবায়োজ (β – 1, 4 লিংকেজ)

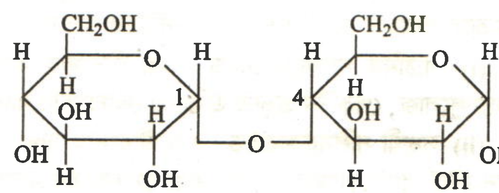
ম্যাল্টোজ (α – 1, 4 লিংকেজ)

(ii) সেলোবায়োজ (Cellobiose) : দুই অণু ß-D গ্লুকোজ ß-1, 4 লিংকেজ দিয়ে সংযুক্ত হয়ে এক অণু সেলোবায়োজ তৈরি করে। কাজেই সেলোবায়োজ একটি ডাইস্যাকারাইড। সাধারণত সেলুলোজ বা লিগনিন-এর আংশিক ভাঙ্গনের ফলে সেলোবায়োজ তৈরি হয়। দুটি সদৃশ গ্লুকোজ অণু যুক্ত হয়ে এক অণু সেলোবোয়োজ গঠিত হয়। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$। সেলোবায়োজ একটি বিজারণক্ষম চিনি (রিডিউসিং শ্যুগার)। কোষ প্রাচীরের একটি গাঠনিক উপাদান সেলোবায়োজ। সেলুলোজকে আংশিকভাবে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক (ইউনিট) গঠিত হয় তাদের মধ্যে অন্যতম যৌগ হলো সেলোবায়োজ। ইমালসিন এনজাইম ও অ্যাসিডের প্রভাবে সেলোবায়োজ ভেঙ্গে দুই অণু গ্লুকোজে পরিণত হয়। আবার ব্রোমিন পানি দিয়ে সেলোবায়োজকে জারিত করলে সেলোবায়োনিক অ্যাসিড তৈরি হয়।

কাজ : কোষ প্রাচীরের একটি গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

(iii) ম্যালটোজ (Maltose) : ম্যালটোজ আর একটি ডাইস্যাকারাইড। দুই অণু α-D গ্লুকোজ, α-1, 4 লিংকেজ দিয়ে সংযুক্ত হয়ে এক অণু ম্যালটোজ গঠন করে। সাধারণত স্টার্চ-এর আংশিক ভাঙ্গনের ফলে ম্যালটোজ তৈরি হয়। এটি আংশিক রিডিউসিং শ্যুগার। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$।

৩। **অলিগোস্যাকারাইড** (**Oligosaccharides;** গ্রিক *oligo* = কম সংখ্যক এবং *saccharin* = চিনি) : যেসব কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রোলাইসিস করলে ৩ থেকে ১০টি মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায় তাদেরকে **অলিগোস্যাকারাইড** বলে (গ্রিক *oligo* = few বা স্বল্প, saccharin = sugar বা চিনি)। সাধারণত ৩ থেকে ১০টি মনোস্যাকারাইড এক একটি অলিগোস্যাকারাইড গঠন করে। একাধিক মনোস্যাকারাইড তাদের গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ (glycosidic linkage) দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত থাকে। একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রক্সিল গ্রুপের সাথে অপর একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রক্সিল গ্রুপের সংযুক্তিকে **গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ** বলে। অলিগোস্যাকারাইডগুলোকে তাদের মধ্যে বিদ্যমান মনোস্যাকারাইডের সংখ্যা দিয়ে শ্রেণিবিভাগ করা হয়; যেমন- তিনটি মনোস্যাকারাইড থাকলে ট্রাইস্যাকারাইড বলে, চারটি থাকলে টেট্রাস্যাকারাইড বলে, পাঁচটি থাকলে পেন্টাস্যাকারাইড বলে ইত্যাদি।

• **ট্রাইস্যাকারাইড (Trisaccharide)** : যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে তিন অণু মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায় তাকে ট্রাইস্যাকারাইড বলে। যেমন– র‍্যাফিনোজ ($C_{18}H_{32}O_{16}$)। একে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে এক অণু গ্লুকোজ, এক অণু ফ্রুক্টোজ এবং এক অণু গ্যালাক্টোজ।

$$\underset{\text{র‍্যাফিনোজ}}{C_{18}H_{32}O_{16}} + 2H_2O \xrightarrow{H^+} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{ফ্রুক্টোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{গ্যালাক্টোজ}}{C_6H_{12}O_6}$$

• **টেট্রাস্যাকারাইড (Tetrasaccharide)** : যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে চার অণু মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায় তাকে টেট্রাস্যাকারাইড বলে। যেমন- স্ট্যাকিওজ (এটি ১ অণু গ্লুকোজ, ১ অণু ফ্রুক্টোজ ও ২ অণু গ্যালাক্টোজ নিয়ে গঠিত) ও স্কার্ডোজ।

• **পেন্টাস্যাকারাইড (Pentasaccharide)** : যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে পাঁচ অণু মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায় তাকে পেন্টাস্যাকারাইড বলে। যেমন- ভার্বাকোজ।

৪। **পলিস্যাকারাইড** (**Polysaccharides;** গ্রিক *poly* = বহু এবং *saccharin* = চিনি) : অনেকগুলো মনোস্যাকারাইড একত্রে পলিমারভুক্ত (polymerised) হয়ে গঠন করে **পলিস্যাকারাইড** (গ্রিক *Poly* = many)। অন্যভাবে বলা যায়, যে কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে অনেকগুলো (দশের অধিক) মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায় তাকে **পলিস্যাকারাইড** বলে। এরা উচ্চ আণবিক ওজন (high molecular weight) বিশিষ্ট জৈব রাসায়নিক পদার্থ। পলিস্যাকারাইড সাধারণত পানিতে অদ্রবণীয় এবং এরা মিষ্টি নয়। স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন ইত্যাদি হলো গুরুত্বপূর্ণ পলিস্যাকারাইড। সেলুলোজ প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। স্টার্চের পরিমাণ দ্বিতীয় পর্যায়ে। প্রকৃতিতে কাজের ভিত্তিতে পলিস্যাকারাইড দু'প্রকার:

(i) **গাঠনিক পলিস্যাকারাইড** : এরা জীবদেহে কাঠামো নির্মাণ বা গঠনের সাথে জড়িত থাকে। যেমন– সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, পেকটিন প্রভৃতি উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর গঠন করে।

(ii) **সঞ্চয়ী পলিস্যাকারাইড** : এরা জীবদেহে সঞ্চিত বস্তু হিসেবে থাকে, যা পরে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যয় হয়ে থাকে। যেমন-স্টার্চ, গ্লাইকোজেন প্রভৃতি। এরা শ্বসনকার্যেও ব্যবহৃত হয়।

$$\underset{\text{স্টার্চ}}{(C_6H_{10}O_5)_n} + \underset{\text{পানি}}{H_2O} \xrightarrow{\text{আর্দ্রবিশ্লেষণ}} \underset{\text{গ্লুকোজ (অনেক অণু)}}{C_6H_{12}O_6}$$

এখানে কয়েকটি পরিচিত পলিস্যাকারাইড-এর বর্ণনা দেয়া হলো।

■ **শ্বেতসার বা স্টার্চ (Starch)** : অ্যামাইলোজ এবং অ্যামাইলোপেকটিন নামক দুটি পলিস্যাকারাইডের সমন্বয়ে গঠিত পদার্থই হলো **স্টার্চ**। উদ্ভিদে স্টার্চ (শ্বেতসার) সঞ্চিত পদার্থরূপে বিরাজ করে। ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট চিনির অধিকাংশই পরিবর্তিত হয়ে স্টার্চ-এ পরিণত হয়। স্টার্চ সাধারণত ঘনীভূত দানা হিসেবে (starch grain) উদ্ভিদ

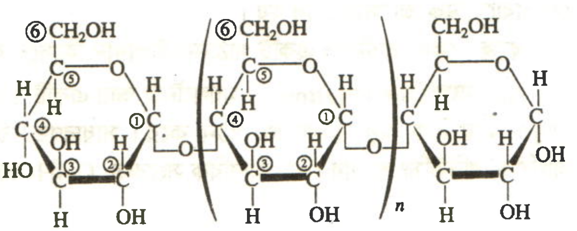

স্টার্চ-এর গঠন।

কোষে বিরাজ করে এবং এদের দানার আকার ও আকৃতি বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন রকম। বীজ, ফল, কন্দ (tuber) প্রভৃতি সঞ্চয়ী অঙ্গে স্টার্চ জমা থাকে। **ধান, গম, আলু স্টার্চের প্রধান উৎস**। সালোকসংশ্লেষণে তৈরি অধিকাংশ গ্লুকোজই স্টার্চে রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন স্টার্চের আকার-আকৃতিতে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। আয়োডিন দ্রবণে স্টার্চ গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করে। স্টার্চ হাইড্রোলাইসিসের ফলে গ্লুকোজ-এ পরিণত হয়।

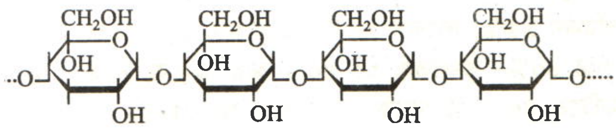

অ্যামাইলোজ-এর গঠন

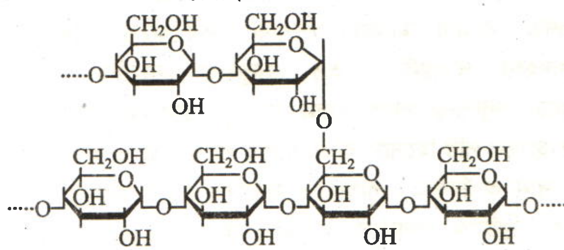

অ্যামাইলোপেকটিন-এর গঠন

অসংখ্য গ্লুকোজ অণু নিয়ে স্টার্চ গঠিত। গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনের প্রকৃতি অনুযায়ী স্টার্চ দু'প্রকার; যথা– অ্যামাইলোজ ও অ্যামাইলোপেকটিন। অ্যামাইলোজের গ্লুকোজ অণুগুলো পরস্পর কার্বনের 1-4 স্থানে সংযুক্ত হয়। সাধারণত 200 থেকে 1000টি গ্লুকোজ অণু নিয়ে একটি অ্যামাইলোজ তৈরি হয়। এর **অণু-শৃঙ্খল অশাখ**। অ্যামাইলোপেকটিন সাধারণত 2000 থেকে 2,00,000টি গ্লুকোজ অণুবিশিষ্ট হয়। অ্যামাইলোপেকটিনের গ্লুকোজ অণুগুলো কার্বনের 1-4 বন্ধন ছাড়াও α-1-6 বন্ধনে যুক্ত থাকে। এর **অণু-শৃঙ্খল শাখান্বিত**। আলু, ধান, গম, ভুট্টা, যব ইত্যাদির স্টার্চে শতকরা ২২ ভাগ **অ্যামাইলোজ** এবং ৭৮ ভাগ **অ্যামাইলোপেকটিন** থাকে। অ্যামাইলোজ থাকায় স্টার্চের দ্রবণে আয়োডিন যোগ করলে কালবর্ণ (কাল-নীল) ধারণ করে। কিন্তু অ্যামাইলোপেকটিনের সাথে বিক্রিয়া করে আয়োডিন লাল বা পার্পল রং প্রদান করে। স্টার্চের আণবিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। স্টার্চের দীর্ঘ অণু বিভিন্ন আকৃতি ও আয়তনের স্থায়ী কণিকা গঠন করে থাকে। স্টার্চ আণুবীক্ষণিক এবং প্রজাতি বিশেষে কণিকার গঠনে পার্থক্য থাকে। যেমন- **গোল আলুর স্টার্চ কণিকা সবচেয়ে বৃহত্তম** আর **চালের স্টার্চ কণিকা সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম**।

স্টার্চের ধর্ম (Properties of starch)

(i) স্টার্চ গন্ধহীন, বর্ণহীন, স্বাদহীন এবং সাদা পাউডারজাতীয় জৈব-রাসায়নিক পদার্থ।
(ii) সাধারণ তাপমাত্রায় স্টার্চ পানি, ইথার ও অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়।
(iii) আয়োডিন দ্রবণে স্টার্চ নীল বর্ণ ধারণ করে।
(iv) উচ্চতাপমাত্রায় স্টার্চ ভেঙ্গে ডেক্সট্রিন ও ম্যালটোজ হয়ে গ্লুকোজ-এ পরিণত হতে পারে।
(v) ফেলিং দ্রবণ স্টার্চ কর্তৃক বিজারিত হয় না।

কাজ : উদ্ভিদদেহে স্টার্চ প্রধানত সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে বিরাজ করে।

পরীক্ষা : আয়োডিন দ্রবণে স্টার্চ নীল বর্ণ ধারণ করে। কারণ স্টার্চের অ্যামাইলোজ উপাদান আয়োডিন অণুকে আবদ্ধ করে জটিল যৌগ গঠন করে। ফলে আয়োডিন পরমাণুগুলোর ইলেকট্রন অরবিটালের পরিবর্তন ঘটে এবং সূর্যালোক শোষণ করে নীল বর্ণ সৃষ্টি করে।

আর্দ্রবিশ্লেষণ : লঘু অ্যাসিড ও এনজাইম দ্বারা স্টার্চকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করলে প্রথমে ডেক্সট্রিন, পরে ম্যালটোজ ও শেষে D-গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। যেমন- স্টার্চ $\xrightarrow{H_2O}$ ডেক্সট্রিন $\xrightarrow{H_2O}$ ম্যালটোজ $\xrightarrow{H_2O}$ D-গ্লুকোজ

স্টার্চের ব্যবহার (Uses of starch) : (i) স্টার্চ প্রধানত খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয়। (ii) সালোকসংশ্লেষণে তৈরি অধিকাংশ গ্লুকোজই স্টার্চে রূপান্তরিত হয়। (iii) অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্লুকোজ, অ্যালকোহল ও চোলাই মদ তৈরিতে স্টার্চ ব্যবহৃত হয়। (iv) স্টার্চ গ্লুকোজে পরিণত হয়ে জীবদেহে শক্তি ও কার্বন অণু সরবরাহ করে থাকে। (v) কাগজ ও আঠা প্রস্তুত করতেও স্টার্চ ব্যবহৃত হয়।

■ **সেলুলোজ (Cellulose) :** সেলুলোজ উদ্ভিদের একটি প্রধান গাঠনিক পদার্থ। উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে গঠিত। অসংখ্য β-D গ্লুকোজ অণু পরস্পর β-1-4 কার্বন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সেলুলোজ তৈরি করে। উদ্ভিদের অবকাঠামো

[DAT: 16-17]

নির্মাণে সেলুলোজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্ভিদদেহে যেহেতু কোনো কঙ্কাল নেই, সেহেতু উদ্ভিদের ভার বহনের দায়িত্ব পালন করে সেলুলোজ। তুলায় সেলুলোজের পরিমাণ ৯৪%, লিনেনে ৯০%, তন্তুকোষে ৯০% এবং কাঠে ৬০%। তৃণলতায় ৩০–৪০% আর জৈব বস্তু সমৃদ্ধ মাটিতে ৪০-৭০% থাকে। সেলুলোজ ঘন H_2SO_4 বা HCl বা NaOH দ্বারা হাইড্রোলাইসিস করে গ্লুকোজে পরিণত করা যায়। মানুষের পরিপাক নালির বিভিন্ন অংশে (মুখগহ্বর, পাকস্থলী ও অন্ত্র) সেলুলেজ এনজাইম না থাকায় সেলুলোজ পদার্থ হজম হয় না; তবে সেলুলোজ গরু-ছাগলে পুষ্টি হিসেবে কাজ করতে পারে। বস্ত্র ও আসবাবপত্র শিল্পের প্রধান উপাদান সেলুলোজ, আর তাই মানবসভ্যতায় এর দান অপরিসীম। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ বিরাজ করে সেলুলোজ। ফরাসি রসায়নবিদ **Anselme Payen** ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সেলুলোজ আবিষ্কার করেন। **Kobayashi** ও **Shode** ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কৃত্রিম সেলুলোজ সংশ্লেষ করেন।

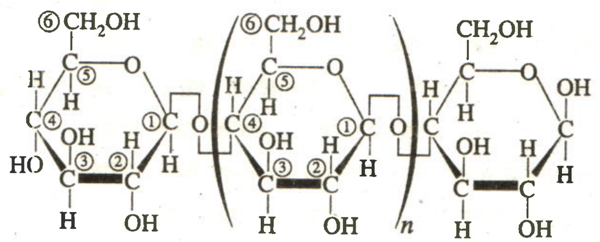

সেলুলোজ-এর গঠন।

সেলুলোজের ধর্ম : (i) সেলুলোজ স্বাদহীন, গন্ধহীন, সাদা ও কঠিন জৈব-রাসায়নিক পদার্থ। (ii) এটি পানিতে অদ্রবণীয়, অবিজারক পদার্থ, আণবিক ভর দুই লক্ষ থেকে কয়েক লক্ষ। (iii) এটি মিষ্টি নয় এবং বিজারণ ক্ষমতাহীন। (iv) আয়োডিন দ্রবণ প্রয়োগে কোনো রং দেয় না। (v) এটি ফাইবার সদৃশ ও শক্ত। (vi) এটির কোনো পুষ্টিগুণ নেই।

সেলুলোজের কাজ : উদ্ভিদের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। উদ্ভিদকে দৃঢ়তা ও সুরক্ষা প্রদান করে এবং ভার বহন করে।

সেলুলোজের ব্যবহার : নিম্নে সেলুলোজের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

(i) উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর সেলুলোজ নির্মিত।

(ii) সেলুলোজ দিয়ে তন্তু তৈরি হয়, যা বস্ত্রশিল্পের প্রধান কাঁচামাল।

(iii) এটি নাইট্রেট বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(iv) এটি অ্যাসিটেট ফটোগ্রাফিক ফিল্মে ব্যবহার করা হয়। ফিল্টার পেপার, টিস্যু পেপার, ফটোগ্রাফিক ফিল্ম, প্যাকেজিং এর দ্রব্যসমূহ সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হয়।

(v) নির্মাণসামগ্রী ও আসবাবপত্র তৈরিতে সেলুলোজ প্রধান উপাদান হিসেবে যান্ত্রিক সাহায্য প্রদান করে থাকে।

(vi) কাঠখেকো কীটপতঙ্গের পৌষ্টিকনালিতে বসবাসকারী একধরনের পরজীবী সেলুলেজ নামক উৎসেচক নিঃসৃত করে কাঠ হজমে সাহায্য করে।

(vii) থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফিতে **স্টেশনারি ফেজ** হিসেবে সেলুলোজ ব্যবহৃত হয়।

(viii) ছত্রাক ও ব্যাক্টেরিয়া থেকে উৎপাদিত সেলুলোজ বর্তমানে বায়োটেকনোলজিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(ix) গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মানুষ সেলুলোজ হজম করতে পারে না কেন?

স্তন্যপায়ী প্রাণীর পরিপাকতন্ত্রে সেলুলোজ হজমকারী এনজাইম তৈরি হয় না। তৃণভোজী স্তন্যপায়ী যেমন- গরু, ছাগল, মহিষ, হরিণ ইত্যাদির পরিপাকতন্ত্রে একধরনের মিথোজীবী ব্যাক্টেরিয়া বাস করে যারা সেলুলোজ হজমকারী এনজাইম **সেলুলেজ** উৎপাদন করে যা সেলুলোজে বিদ্যমান β-1-4 গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ ভেঙ্গে সেলুলোজকে হজমে সাহায্য করে। মানুষের পরিপাকতন্ত্রে এ ধরনের কোনো মিথোজীবী ব্যাক্টেরিয়া না থাকায় মানুষ সেলুলোজ হজম করতে পারে না। কিন্তু মানুষের খাদ্য তালিকায় আঁশজাতীয় খাদ্য থাকা দরকার, কেননা সেলুলোজ মল উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

RMDAC

স্টার্চ ও সেলুলোজ এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	স্টার্চ	সেলুলোজ
১। গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন	স্টার্চ অণুতে প্রায় 1,200 থেকে 6,000 গ্লুকোজ একক α-গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে।	সেলুলোজে প্রায় 300 থেকে 3,000 গ্লুকোজ একক β-গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে।
২। পলিমার	এটি হলো α–D গ্লুকোজ পলিমার।	এটি হলো β–D গ্লুকোজ পলিমার।
৩। পলিমারের গঠন	স্টার্চ অণু শাখান্বিত গ্লুকোজ পলিমার।	সেলুলোজ অণু অশাখান্বিত অর্থাৎ সরল শিকল পলিমার।
৪। সঞ্চিত খাদ্য	উদ্ভিদদেহে এটি সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে থাকে।	উদ্ভিদদেহে এটি গাঠনিক উপাদান হিসেবে থাকে।
৫। বর্ণ	আয়োডিনের সাথে বিক্রিয়া করে নীল বর্ণ প্রদান করে।	আয়োডিনের সাথে বিক্রিয়া করে কোনো বর্ণ প্রদান করে না।
৬। হজম	এটি গরু-ছাগল ও মানুষ হজম করতে পারে।	এটি গরু-ছাগল হজম করতে পারলেও মানুষ তা পারে না। কারণ মানুষে সেলুলেজ এনজাইম থাকে না।

■ **গ্লাইকোজেন (Glycogen) :** গ্লাইকোজেন হলো একটি পুষ্টিজাত পলিস্যাকারাইড। এটি প্রাণিদেহের প্রধান সঞ্চিত খাদ্য উপাদান হলেও সায়ানোব্যাকটেরিয়া (নীলাভ সবুজ শৈবাল) ও কতিপয় ছত্রাকের (ঈস্ট) সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে বিরাজ করে। গ্লাইকোজেনের মূল গাঠনিক একক হলো α-D-গ্লুকোজ। অ্যামাইলোপেকটিনের মতো এর অণু শৃঙ্খলও শাখান্বিত। α-1, 6 লিংকেজের মাধ্যমে শাখার সৃষ্টি হয়। প্রতি শাখায় সাধারণত ১০ থেকে ২০টি গ্লুকোজ অণু থাকে। হাইড্রোলাইসিস শেষে গ্লাইকোজেন হতে কেবল α-D-গ্লুকোজ অণু পাওয়া যায়। এর আণবিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। প্রাণিদেহের যকৃত (লিভার) ও মাংসপেশিতে বেশি করে গ্লাইকোজেন জমা থাকে যা প্রয়োজনে গ্লুকোজে পরিণত হয়ে কার্বন ও শক্তি সরবরাহ করে। এজন্য গ্লাইকোজেনকে প্রাণিজ স্টার্চ বলে। ফরাসি শারীরতত্ত্ববিদ Claude Bernard ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে গ্লাইকোজেন আবিষ্কার করেন।

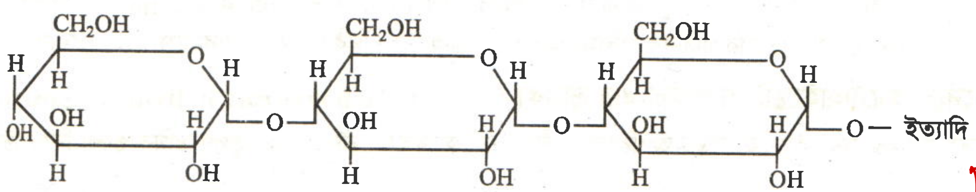

গ্লাইকোজেন অণুর একাংশ (α -1, 4 লিংকেজ)। চিত্রে α -1, 6 লিংকেজ শাখা দেখানো হয় নি।

[MAT: 23-24]

গ্লাইকোজেনের ধর্ম (Properties of glycogen)

(i) গ্লাইকোজেন পানিতে আংশিক দ্রবণীয়। **(ii)** এটি সাদা পাউডারজাতীয় জৈব-রাসায়নিক পদার্থ। **(iii)** আয়োডিন দ্রবণ প্রয়োগে লালচে বেগুনি বর্ণ ধারণ করে। **(iv)** ঠাণ্ডা পানিতে এটি কলয়েড সাসপেনশন তৈরি করে। **(v)** তাপ দিলে এর লাল বর্ণ চলে যায়। **(vi)** ঠাণ্ডা অবস্থায় কালো বর্ণ ফিরে আসে। **(vii)** আংশিক আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে ম্যালটোজ, আর পূর্ণ আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে α–D-গ্লুকোজ অণু প্রদান করে। **(viii)** গ্লাইকোজেন গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজ অণু সৃষ্টি করে। **(ix)** যকৃতের গ্লাইকোজেন গ্লুকোজে পরিণত হয়ে রক্তে প্রবাহিত হয় এবং রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

গ্লাইকোজেনের ব্যবহার (Uses of glycogen)

(i) পেশিতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন পেশির কাজে শক্তি যোগায়। **(ii)** যকৃতের গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজে পরিণত করে। **(iii)** এটি রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

কাজ : সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে কাজ করে।

কাজ : গ্লুকোজ, সুকরোজ এবং স্টার্চ এর গঠন ও কাজ শিক্ষার্থীদের একেক দল এক একটি উপস্থাপন করবে।

(গ) বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে : বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেট দু'প্রকার। যথা—

(i) রিডিউসিং শ্যুগার বা বিজারক শর্করা : যেসব কার্বোহাইড্রেটে কমপক্ষে একটি মুক্ত অ্যালডিহাইড (–CHO) বা কিটোন (=CO) গ্রুপ থাকায় ক্ষারীয় আয়নকে বিজারিত করতে পারে তাদেরকে **রিডিউসিং শ্যুগার** বা **বিজারক শর্করা** বলে। যেমন-গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ম্যানোজ প্রভৃতি। এরা বেনেডিক্ট দ্রবণ ও ফেলিং দ্রবণ দ্বারা বিজারিত হয়।

(ii) নন-রিডিউসিং শ্যুগার বা অবিজারক শর্করা : যেসব কার্বোহাইড্রেটে একটিও মুক্ত অ্যালডিহাইড (–CHO) বা কিটোন (=CO) গ্রুপ না থাকায় ক্ষারীয় আয়নকে বিজারিত করতে পারে না তাদেরকে **নন-রিডিউসিং শ্যুগার** বা **অবিজারক শর্করা** বলে। যেমন-সুকরোজ, ট্রিহ্যালোজ, পলিস্যাকারাইড প্রভৃতি। সুকরোজ α–D গ্লুকোজের ১ নং কার্বনের OH এবং β–D ফ্রুক্টোজের ২নং কার্বনের OH থেকে এক অণু পানি অপসারিত হয়ে একটি অক্সিজেন ব্রিজ (–O–) তৈরি হয়। এর ফলে এদের মুক্ত –CHO বা, C=O গ্রুপ থাকে না। এদেরকে প্রাথমিক অবস্থায় আর্দ্রবিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। এরপর অন্য **যৌগকে** বিজারিত করতে পারে।

□ **হেমিসেলুলোজ (Hemicellulose) :** উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরে সেলুলোজ এবং পেকটিন পদার্থ ব্যতীত অন্যান্য পলিস্যাকারাইডকে হেমিসেলুলোজ বলে। যেমন- গ্লুকান, জাইলান ইত্যাদি।

□ **কাইটিন (Chitin) :** এটি নাইট্রোজেনবিশিষ্ট পলিস্যাকারাইড। এটি বিশ্বে প্রচুর পরিমাণে থাকা দ্রব্যের একটি। ছত্রাকের কোষ প্রাচীর এবং কাঁকড়া, লোবস্টার ইত্যাদির বহিঃকঙ্কালে কাইটিন থাকে।

কার্বোহাইড্রেট ডেরিভেটিভ্স (Carbohydrate derivatives)

মূল গঠনে রাসায়নিক পরিবর্তন বা কোনো কার্যকর গ্রুপ (functional group) যুক্ত হয়ে কিছু নতুন ধরনের কার্বোহাইড্রেটের উদ্ভব হয়। এরা হলো কার্বোহাইড্রেট ডেরিভেটিভ্স। ফ্রুক্টোজ এর OH গ্রুপের সাথে ফসফেট যুক্ত হয়ে ফ্রুক্টোজ ১, ৬-বিস ফসফেট (শ্যুগার ফসফেট) হয়ে থাকে (যা গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় ঘটে থাকে)। OH গ্রুপ অ্যামিনো ($-NH_2$) গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে **গ্লুকোসামিন** (Glucosamine), **গ্যালাক্টোসামিন** (Galactosamine) হয়ে থাকে। তরুণাস্থির প্রধান দ্রব্য গ্যালাক্টোসামিন। গ্লুকোসামিন পলিমার হয়ে তৈরি করে **কাইটিন** (Chitin) যা পতঙ্গ, কাঁকড়া, লোবস্টার এবং ছত্রাক কোষ প্রাচীরের গাঠনিক পলিস্যাকারাইড। কাইটিন পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে থাকা দ্রব্যের একটি।

জীবদেহে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা-এর ভূমিকা (Role of Carbohydrate in living organisms)

জীবদেহ গঠনের জন্য কার্বোহাইড্রেট অপরিহার্য। জীবদেহে কার্বোহাইড্রেট-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

১। জীবদেহে **শক্তির প্রধান উৎস** হলো শর্করা (কার্বোহাইড্রেট)। শর্করা জারিত হয়ে যে **শক্তি** সরবরাহ করে তা বিপাকীয় কাজে ব্যবহৃত হয়।
২। বিভিন্ন শৈবাল ও উদ্ভিদদেহে স্টার্চ, ইনুলিন ইত্যাদি হিসেবে শর্করা **সঞ্চিত** থাকে।
৩। উদ্ভিদদেহের **গাঠনিক উপাদান** (শুষ্ক ওজনের ৫০–৮০%) হিসেবে উপস্থিত থাকে।
৪। সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, কাইটিন, পেকটিন ইত্যাদি পদার্থ **কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান**।
৫। প্রাণী, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া **গ্লাইকোজেন** নামক শর্করা সঞ্চয় করে।
৬। অ্যামিনো অ্যাসিড ও ফ্যাটি অ্যাসিড **বিপাকে** সাহায্য করে এবং শরীরে প্রোটিনের অভাব হলে শর্করা থেকে প্রোটিন সৃষ্টি হয় ও প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হয়।
৭। শর্করা দেহে বাড়তি প্রোটিন যোগানের মাধ্যমে **দেহ প্রস্তুত** ও মেরামতের কাজে সাহায্য করে।
৮। RNA ও DNA-র অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে **রাইবোজ** ও **ডিঅক্সিরাইবোজ** নামক শর্করা।
৯। প্রাণিদেহে হাড়ের সন্ধিস্থলে **লুব্রিকেন্ট** (lubricant) বা **পিচ্ছিল পদার্থ** হিসেবেও ভূমিকা পালন করে।
১০। ATP, ADP, GTP, GDP, NAD, NADP, FAD ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ যৌগসমূহের গাঠনিক উপাদান হিসেবেও শর্করা গুরুত্বপূর্ণ।
১১। মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান এর অনেক উপাদান শর্করা থেকেই পাওয়া যায়।
১২। **সেলুলোজ** জাতীয় শর্করা উদ্ভিদকে **দৃঢ়তা** ও **সুরক্ষা** দেয় এবং ভার বহন করে।

অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino Acids)

অ্যামিনো অ্যাসিড হলো অর্গানিক মলিকিউল (জৈব-অণু) যা প্রোটিনের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী Emil Fischer ও Franz Hofmeister, 1902 খ্রিষ্টাব্দে প্রোটিন অণুর গাঠনিক একক হিসেবে অ্যামিনো অ্যাসিড আবিষ্কার করেন। কোনো জৈব অ্যাসিডের এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু **অ্যামিনো গ্রুপ** ($-NH_2$) দ্বারা প্রতিস্থাপনের ফলে যে জৈব অ্যাসিড উৎপন্ন হয় তাকে **অ্যামিনো অ্যাসিড বলা হয়। প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিডে কমপক্ষে একটি অ্যামিনো গ্রুপ** ($-NH_2$) **এবং একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ** ($-COOH$) থাকে। এতে অন্যান্য সক্রিয় কার্যকরী গ্রুপও থাকতে পারে। কাজেই অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্যকরী গ্রুপ কী কী তার ওপর নির্ভর করে সেই অ্যাসিডের গুণাবলি। উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড আছে। এর মধ্যে **বিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্নভাবে সমন্বিত ও সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন রকম প্রোটিন তৈরি করে।**

প্রোটিন গঠনকারী অ্যামিনো অ্যাসিডের সাধারণ গঠন :

অ্যামিনো অ্যাসিড এর কার্বক্সিল গ্রুপ এর নিকটবর্তী কার্বন-পরমাণুটিকে α-কার্বন বলা হয় এবং কার্বক্সিল গ্রুপটি α-কার্বনের সাথে যুক্ত থাকলে তাকে α- অ্যামিনো অ্যাসিড বলা হয়।

> অ্যামিনো অ্যাসিডের সাধারণ গঠন : *R—C(H)(NH$_2$)—COOH
>
> *R-গ্রুপ বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডে বিভিন্ন হয়

অ্যামিনো অ্যাসিডের রাসায়নিক গঠন : অ্যামিনো অ্যাসিডের সাধারণ রাসায়নিক সংকেত হলো $R-CH.NH_2.COOH$। এখানে R হলো একটি হাইড্রোজেন পরমাণু বা কার্বনযুক্ত কোনো জৈব যৌগ। **অ্যামিনো অ্যাসিডে অন্তত একটি অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$), একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ ($-COOH$) এবং একটি পার্শ্বশিকল গ্রুপ (R) থাকে।** তবে কোনো কোনো অ্যামিনো অ্যাসিডে ২টি অ্যামিনো গ্রুপ কিংবা ২টি কার্বোক্সিল গ্রুপ কিংবা সালফার থাকতে পারে। প্রকৃতিতে বেশির ভাগ অ্যামিনো অ্যাসিডই α-অ্যামিনো অ্যাসিড।

R-গ্রুপ H হলে গ্লাইসিন

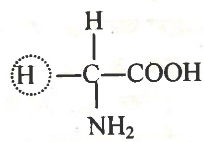

α-কার্বনে সংযুক্ত R-গ্রুপ বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডে বিভিন্ন রকম হয়; যেমন–

R-গ্রুপ CH_2OH হলে অ্যামিনো অ্যাসিড সিরিন।

R-গ্রুপ CH_2SH হলে অ্যামিনো অ্যাসিড সিস্টিন।

R-গ্রুপ CH_3 হলে অ্যালানিন

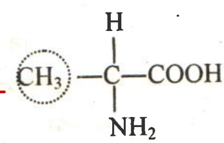

অ্যামিনো অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য

১। মানবদেহের প্রায় সব অ্যামিনো অ্যাসিডই α-অ্যামিনো অ্যাসিড।

২। এরা পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়।

৩। এরা স্বাদহীন, মিষ্টি বা তিক্ত পদার্থ।

৪। এরা বর্ণহীন, স্ফটিকাকার পদার্থ।

৫। মৃদু অ্যাসিড বা ক্ষারে অ্যামিনো অ্যাসিড লবণ সৃষ্টি করে।

৬। এরা উচ্চ গলনাঙ্কবিশিষ্ট।

৭। বিশুদ্ধ প্রোটিনকে কোনো রাসায়নিক পদার্থ কিংবা এনজাইম এর সাহায্যে সম্পূর্ণ হাইড্রোলাইসিস (আর্দ্র-বিশ্লেষণ) করলে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।

৮। এক বা একাধিক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড পেপটাইড বন্ধনীর মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে প্রোটিন গঠন করে।

৯। অ্যাসিড ও ক্ষারবিশিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডের মূলককে **জুইটার আয়ন** (Zuitter Ions; Zuitter = hybrid) বলে।

> প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিডে একটি কেন্দ্রীয় কার্বনকে ঘিরে—
> (i) একটি অ্যামিনো গ্রুপ
> (ii) একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ
> (iii) একটি হাইড্রোজেন এবং
> (iv) একটি R-গ্রুপ থাকে

কার্বোক্সিল গ্রুপ অ্যাসিডিক। অ্যামিনো-অ্যাসিডে কার্বোক্সিল গ্রুপ থাকে, তাই নামের সাথে অ্যাসিড (অ্যামিনো অ্যাসিড) যুক্ত হয়েছে। একই কারণে ফ্যাটি অ্যাসিড নাম হয়েছে।

অ্যামিনো অ্যাসিডের শ্রেণিবিভাগ

উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ মিলে সর্বমোট ২৮টির মতো অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে। এগুলোকে মোটামুটি ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা— (১) অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিনো অ্যাসিড, (২) অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড, (৩) হেটেরোসাইক্লিক অ্যামিনো অ্যাসিড।

১। অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিনো অ্যাসিড : অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্শ্বশিকল গ্রুপটি (R-গ্রুপ) অ্যালিফ্যাটিক যৌগের হলে তাকে অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিনো অ্যাসিড বলে। যেমন— গ্লাইসিন, অ্যালানিন, ভ্যালিন।

২। অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড : অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্শ্বশিকল গ্রুপটি (R-গ্রুপ) অ্যারোমেটিক যৌগের হলে তাকে অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড বলে। যেমন— ফিনাইল অ্যালানিন, টাইরোসিন।

৩। হেটেরোসাইক্লিক অ্যামিনো অ্যাসিড : অ্যামিনো অ্যাসিডে অ্যালিফ্যাটিক ও অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিডের বিপরীত ধর্ম পরিলক্ষিত হলে তাকে হেটেরোসাইক্লিক অ্যামিনো অ্যাসিড বলে। যেমন— ট্রিপটোফ্যান, প্রোলিন, হিস্টিডিন।

পোলার এবং নন-পোলার অ্যামিনো অ্যাসিড

(i) নন-পোলার = ১০টি, যেমন— অ্যালানিন, ভ্যালিন

(ii) পোলার-আনচার্জড = ৫টি, যেমন— সেরিন, থ্রিওনিন

(iii) পোলার-নেগেটিভ চার্জড = ২টি, যেমন— গ্লুটামিক অ্যাসিড

(iv) পোলার-পজিটিভ চার্জড = ৩টি, যেমন— লাইসিন, হিস্টিডিন

সাধারণত ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্ন প্রোটিন গঠনে অংশগ্রহণ করে। এদেরকে বলা হয় **প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড**। এছাড়াও অনেক অ্যামিনো অ্যাসিড আছে যেগুলো প্রোটিন তৈরিতে অংশগ্রহণ করে না। এদেরকে বলা হয় **নন-প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড**। অরনিথিন (ornithine), সাইট্রুলিন (citruline), হেমোসেরিন (haemoserine) প্রভৃতি কিছু নন-প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড। এদের কিছু ইউরিয়া (যেমন-অরনিথিন) সংশ্লেষে বিশেষ ভূমিকা পালন করে; আবার কিছু (যেমন- হেমোসেরিন) প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়। প্রোটিনে হাইড্রক্সিপ্রোপিনের উপস্থিতি খুবই সীমিত। এটি বিরল অ্যামিনো অ্যাসিড। [M.A.T: 12-13]

খাদ্যে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে অ্যামিনো অ্যাসিড দু ভাগে বিভক্ত। যথা— [MAT: 17-18]

১। অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড : এরা দেহাভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হয় না। উদাহরণ- লিউসিন, আইসোলিউসিন, লাইসিন, থ্রিওনিন, ভ্যালিন, মেথিওনিন, ফিনাইল অ্যালানিন এবং ট্রিপটোফ্যান (৮টি)। শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড ১০টি। অতিরিক্ত- আরজিনিন ও হিস্টিডিন।

২। অনাত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড : এরা দেহাভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হতে পারে। সংখ্যায় ১২টি এবং শিশুদের ক্ষেত্রে ১০টি।

২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডের নামের তালিকা

	অ্যামিনো অ্যাসিড	সংক্ষিপ্ত নাম	
১	লিউসিন	Leu	L
২	আইসোলিউসিন	Ileu	I
৩	লাইসিন	Lys	K
৪	মেথিওনিন	Met	M
৫	ভ্যালিন	Val	V
৬	সেরিন	Ser	S
৭	প্রোলিন	Pro	P
৮	থ্রিওনিন	Thr	T
৯	অ্যালানিন	Ala	A
১০	টাইরোসিন	Tyr	Y

	অ্যামিনো অ্যাসিড	সংক্ষিপ্ত নাম	
১১	হিস্টিডিন	His	H
১২	অ্যাসপারাজিন	Asn	N
১৩	সিস্টিন	Cys	C
১৪	আরজিনিন	Arg	R
১৫	গ্লাইসিন	Gly	G
১৬	ট্রিপ্টোফ্যান	Trp	W
১৭	গ্লুটামিন	Gln	O
১৮	গ্লুটামিক অ্যাসিড	Glu	E
১৯	অ্যাসপারটিক অ্যাসিড	Asp	D
২০	ফিনাইল অ্যালানিন	Phe	I

অ্যামিনো অ্যাসিডের কাজ : ১। প্রোটিন তৈরি তথা আমিষ সংশ্লেষণ করে। ২। জীবদেহ গঠনে ভূমিকা রাখে। ৩। কিছু ভিটামিন, এনজাইম, ইনডোল হরমোন অ্যান্টিবডি সংশ্লেষণে সাহায্য করে। ৪। ইউরিয়া সংশ্লেষণে সাহায্য করে। ৫। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ৬। দেহে pH নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। ৭। চুল ও চোখের কোরাকয়েড স্তরে বিদ্যমান মেলানিন রঞ্জক সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

প্রোটিন (Protein) বা আমিষ

গ্রিক *'Proteios'* হতে Protein শব্দের উৎপত্তি। *'Proteios'* অর্থ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রোটিন জীবদেহের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থ। বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্নভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে এক একটি প্রোটিন অণু গঠন করে। প্রোটিন শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন জি. মুল্ডার (G. Mulder) ১৮৩৯ সালে।

প্রোটিন হলো অসংখ্য অ্যামিনো অ্যাসিড সমন্বয়ে গঠিত বৃহদাকার যৌগিক জৈব-অণু। অন্যভাবে বলা যায়, **প্রোটিন হলো উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট বৃহৎ অণুর জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপন্ন করে।** অর্থাৎ **অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমারকে প্রোটিন বা আমিষ বলে।** একটি কোষের অভ্যন্তরে সারাক্ষণ শত শত প্রকার প্রোটিন তৈরি হয়। অ্যামিনো অ্যাসিডের বহু অণু [কমপক্ষে ৫১টি–(যেমন ইনসুলিন)] পেপটাইড বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয়ে একটি প্রোটিন অণু তৈরি করে।

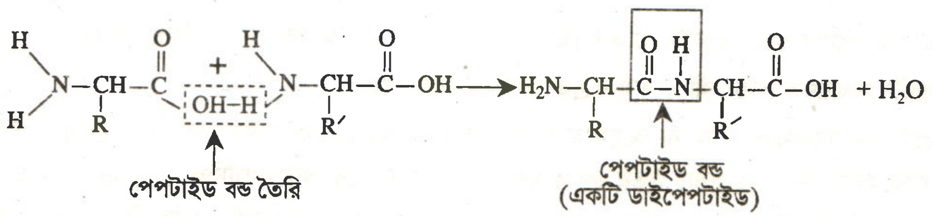

১টি অ্যামিনো অ্যাসিডের OH (কার্বক্সিল গ্রুপের) এবং অপর ১টি অ্যামিনো অ্যাসিডের H (অ্যামিনো গ্রুপের) যুক্ত হয়ে পানি বের হয়ে যায় এবং C–N বন্ধন তৈরি হয়।

বিস্তার : জীবদেহের প্রায় সর্বত্র প্রোটিন বিরাজমান। জীবদেহের সব অঙ্গে গাঠনিক বস্তু (structural elements) হিসেবে প্রোটিন বিদ্যমান। জৈব-ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী এনজাইম, অ্যান্টিবডি, হরমোন এগুলোও প্রোটিন। **সব এনজাইম প্রোটিন কিন্তু সব প্রোটিন এনজাইম নয়। জীবদেহে শুষ্ক ওজনের ৫০% প্রোটিন।**

গঠন : বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্নভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে এক একটি প্রোটিন গঠন করে। **একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বোক্সিল গ্রুপ (–COOH) অপর একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের α-অ্যামাইনো গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়ে যে অ্যামাইড বন্ড গঠন করে তাকে পেপটাইড বন্ড (peptide bond) বলে।** প্রতিটি পেপটাইড বন্ড তৈরিতে এক অণু পানি নির্গত হয়। দুটি ভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হয়ে গঠন করে **ডাইপেপটাইড**, তিনটি যুক্ত হয়ে গঠন করে **ট্রাইপেপটাইড**, চার থেকে দশটি সংযুক্ত হয়ে গঠন করে **অলিগোপেপটাইড**। বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রায় ৫০টি অণু পেপটাইড বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয়ে **পলিপেপটাইড** সৃষ্টি করে। **প্রোটিন হলো পলিপেপটাইড যৌগ।**

পেপটাইড : পেপটাইড বন্ড দ্বারা সংযুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি শিকল।

পলিপেপটাইড : পেপটাইড যাতে ৫০টির অধিক অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে।

প্রোটিন : এক বা একাধিক পলিপেপটাইড যা ফোল্ডেড হয়ে নির্দিষ্ট থ্রিডাইমেনশনাল আকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে। **কেবলমাত্র ফোল্ডেড অবস্থা প্রাপ্ত হলেই প্রোটিন কার্যকরী হয়।**

এক পলিপেপটাইড দ্বারা গঠিত প্রোটিন = লাইসোজাইম
দুই পলিপেপটাইড দ্বারা গঠিত প্রোটিন = ইনটেগ্রিন
তিন পলিপেপটাইড দ্বারা গঠিত প্রোটিন = কোলাজেন
চার পলিপেপটাইড দ্বারা গঠিত প্রোটিন = হিমোগ্লোবিন

প্রকরণ : প্রতিটি জীবদেহে অসংখ্য ধরনের প্রোটিন থাকে। একটি জীবদেহে যতটি জিনের প্রকাশ ঘটে ঐ দেহে কমপক্ষে তত ধরনের প্রোটিন থাকে। কাজেই হাজার হাজার ধরনের প্রোটিন একটি জীবদেহে থাকতে পারে। আবার দুটি প্রজাতির মধ্যে যেহেতু জিনগত পার্থক্য থাকে, সেহেতু এদের মধ্যে প্রোটিনের ধরনগত পার্থক্যও থাকে। একই প্রজাতির দুটি জীবের কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে, কাজেই একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যেও প্রোটিনের কাঠামোগত পার্থক্য থাকবে।

সংশ্লেষণের স্থান : কোষস্থ রাইবোসোমে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

প্রোটিনের বৈশিষ্ট্য

১। প্রোটিন কলয়েড প্রকৃতির, অধিকাংশ কেলাসিত।

২। প্রোটিনকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে (অ্যাসিড, ক্ষার ও এনজাইম সহযোগে) অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।

৩। বহুবিধ ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রোটিনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটানো যায়।

৪। প্রোটিন পানিতে, লঘু অ্যাসিডে, ক্ষার ও মৃদু লবণের দ্রবণে দ্রবণীয় কিন্তু অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়।

৫। এটি কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দিয়ে গঠিত। এছাড়াও এতে সালফার, আয়রন ও তামা থাকতে পারে।

৬। অ্যাসিড প্রয়োগ করলে প্রোটিন তঞ্চিত (জমাট বাঁধা) হয়। এতে আণবিক গঠন পরিবর্তিত হয়।

৭। প্রোটিন সাধারণত তড়িৎধর্মী ও বাফার দ্রবণ হিসেবে কাজ করে।

৮। প্রোটিনের মনোমার অ্যামিনো অ্যাসিডে ক্ষারীয় গ্রুপ ($-NH_2$) এবং অম্লীয় গ্রুপ ($-COOH$) থাকে বলে এটি একই সাথে ক্ষারীয় ও অম্লীয় উভয় গুণ প্রকাশ করে। এজন্য একে **অ্যাম্ফোটেরিক** (amphoteric) প্রোটিন বলে।

প্রোটিনের শ্রেণিবিভাগ (Types of Protein) : *Escherichia coli* এর একটি কোষে তিন হাজার ধরনের প্রোটিন থাকে। **মানুষের দেহে প্রায় এক লক্ষ ধরনের প্রোটিন আছে** যা *E. coli* এর প্রোটিন থেকে আলাদা। প্রোটিনের বিশাল রাজ্যে শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি বিভিন্ন প্রকার।

(ক) জৈবিক কার্যাবলির ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ : প্রোটিন দু'ধরনের; যথা–

(i) গাঠনিক প্রোটিন (Structural protein) : এরা জীবদেহের বিভিন্ন অংশ গঠন করে। কোষ এবং টিস্যুর গঠনকে সুদৃঢ় করে। এ ধরনের প্রোটিন ত্বক, চুল, শিং, ক্ষুর, অন্তঃকঙ্কাল (অস্থি ও তরুণাস্থি), যোজক টিস্যু ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ : **কেরাটিন** (ত্বক, শিং, নখ, ক্ষুর, পালক ইত্যাদি), **কোলাজেন** (অস্থি, টেনডন, যোজক টিস্যু ইত্যাদি), **ফাইব্রাইন** (সিল্ক ও মাকড়সার জাল), **স্ক্লেরোটিন** (পতঙ্গের বহিঃকঙ্কাল), **কনড্রিন** (তরুণাস্থিতে), **সেইন** (অস্থিতে)। [MAT 22-23]

(ii) কার্যকরী প্রোটিন (Functional protein) : এরা জীবদেহে বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণ করে। এদেরকে **নিয়ন্ত্রক** বা **রেগুলেটরি প্রোটিনও** বলা হয়। যেমন- এনজাইম, হরমোন, ভিটামিন, শ্বাসরঞ্জক ইত্যাদি।

(খ) আকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ : আকৃতি অনুযায়ী প্রোটিন দু'ধরনের; যথা–

(i) তন্তুময় প্রোটিন (Fibrous protein) : যখন পলিপেপটাইডগুলো প্রোটিনে সমান্তরালভাবে একটি অক্ষ বরাবর সজ্জিত থাকে তখন তা লম্বা তন্তুর আকার ধারণ করে। এমন আকৃতির প্রোটিনকে **তন্তুময় প্রোটিন** বলে। যেমন– কেরাটিন, কোলাজেন, ফাইব্রাইন ইত্যাদি।

(ii) গ্লোবিউলার প্রোটিন (Globular protein) : যেসব প্রোটিনের গঠন গোলাকৃতির হয় তাদের **গ্লোবিউলার প্রোটিন** বলে। যেমন- মায়োগ্লোবিন, ইনস্যুলিন, হিমোগ্লোবিন ইত্যাদি। [MAT: 14-15]

(গ) গঠন অনুসারে শ্রেণিবিভাগ : গঠন অনুসারে প্রোটিন চার প্রকার। ১। প্রাইমারি ২। সেকেন্ডারি ৩। টারশিয়ারি এবং ৪। কুয়াটার্নারি।

[MAT: 11-12]

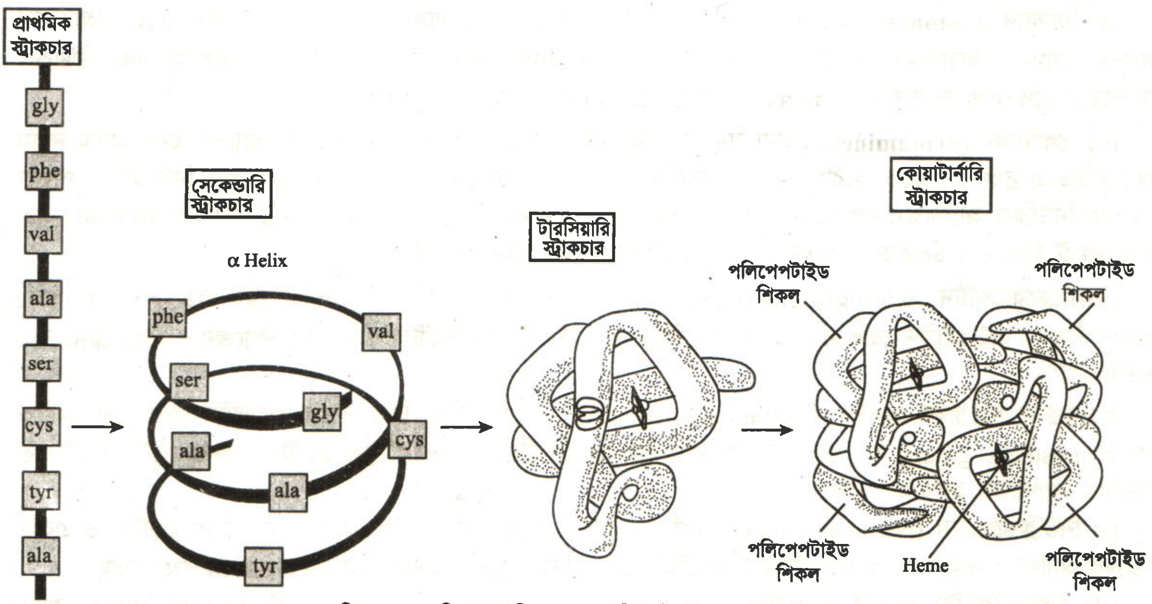

চিত্র ৩.২ : হিমোগ্লোবিন-এর প্রোটিন স্ট্রাকচার-এর ৪টি স্তর।

(ঘ) ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলি ও দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে : আধুনিক তথ্য অনুসারে ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলি ও দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে প্রোটিনকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– (১) সরল প্রোটিন, (২) যুগ্ম প্রোটিন ও (৩) উদ্ভূত প্রোটিন।

[DAT: 17-18]

১। সরল প্রোটিন (Simple protein) : যে প্রোটিনকে এনজাইম বা অ্যাসিড দিয়ে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে অ্যামিনো অ্যাসিড ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না, তাকে **সরল প্রোটিন** বলে। দ্রবণীয়তার (solubility) ওপর ভিত্তি করে সরল প্রোটিনকে আবার ৭ ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা–

(i) অ্যালবিউমিন (Albumin) : যেসব প্রোটিন পানিতে সহজে দ্রবীভূত হয়ে ঘোলাটে দ্রবণ সৃষ্টি করে, তাকে **অ্যালবিউমিন** বলে। এরা পানিতে এবং লঘু লবণ দ্রবণে দ্রবণীয়। তাপ দিলে এরা জমাট বাঁধে। যব ও বার্লির **β-অ্যামাইলোজ**, ডিমের সাদা অংশে **ওভালবুমিন** (১০–১২%), রক্তরস ও লসিকার **সিরাম–অ্যালবিউমিন** (৪–৫%), দুধের **ল্যাকটালবুমিন**, গম বীজে **লিউকোসিন**, শিম বীজে **লিগুমেলিন**, মাংসপেশির **মায়ো-অ্যালবিউমিন** ইত্যাদি অ্যালবিউমিন প্রোটিনের উদাহরণ।

(ii) গ্লোবিউলিন (Globulins) : এ জাতীয় প্রোটিন পানিতে প্রায় অদ্রবণীয়, তবে লঘু লবণ দ্রবণে দ্রবণীয়। তাপে এরাও জমাট বাঁধে। বীজে এ ধরনের প্রোটিন বেশি থাকে। যেমন-ডিমের কুসুম (অভোগ্লোবিউলিন), রক্তরস (সিরাম গ্লোবিউলিন), চোখের লেন্স (ক্রিস্টালিন গ্লোবিউলিন), মাংসপেশি (মায়োসিন গ্লোবিউলিন) ইত্যাদি গ্লোবিউলিন প্রোটিনের উদাহরণ। শন, পাট, তুলা ইত্যাদি আঁশে এডেস্টিন, মটর বীজে **লেগুলিন**, চিনাবাদামে **এরাচিন** এবং আলুতে **টিউবেরিন** নামক উদ্ভিজ্জ গ্লোবিউলিন বিদ্যমান।

MAT: 21-22

(iii) গ্লুটেলিন (Glutelins) : এরা পানি ও লবণে অদ্রবণীয়। লঘু অ্যাসিড বা লঘু ক্ষার দ্রবণে দ্রবণীয়। তাপে এরা জমাট বাঁধে না। শস্যদানায় এ জাতীয় প্রোটিন অধিক থাকে। গমের **গ্লুটেনিন** (glutenin) এবং চালের **অরাইজেনিন** (orygenin) গ্লুটেলিন প্রোটিনের উদাহরণ।

(iv) প্রোলামিন (Prolamins) : এরা পানি ও অ্যাবসলুট ইথানলে (১০০%) অদ্রবণীয়, কিন্তু ৭০–৮০% ইথানলে দ্রবণীয়। হাইড্রোলাইসিস শেষে যে প্রোটিন প্রচুর প্রোলিন ও অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে তা **প্রোলামিন**। **ভুট্টার জেইন** (zein), গম ও রাইয়ের **গ্লিয়াডিন** (gliadin) এবং যব ও বার্লির **হর্ডিন** (hordein) প্রোলামিন প্রোটিনের উদাহরণ। এরা শুধু বীজে থাকে। প্রোলামিন তাপে জমাট বাঁধে না।

RMDAC

(v) **হিস্টোন (Histones)** : এ জাতীয় প্রোটিন পানিতে দ্রবণীয়। এদের মধ্যে বেশি পরিমাণে ক্ষারীয় (basic) অ্যামিনো অ্যাসিড (যেমন– আরজিনিন, লাইসিন) থাকে। এরা তাপে জমাট বাঁধে না। এদেরকে নিউক্লিয়াসে এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথে বেশি দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে **নিউক্লিয়োহিস্টোনের** নাম বলা যায়।

(vi) **প্রোটামিন (Protamines)** : এরা সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রোটিন। প্রোটামিনগুলো পানি, লঘু অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড-এ দ্রবণীয়। এতে ক্ষারীয় অ্যামিনো অ্যাসিড (যেমন- আরজিনিন) বেশি থাকে। এদেরকে নিউক্লিয়াসে পাওয়া যায় এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথেও দেখা যায়। প্রোটামিন-এ কোনো সালফার, টাইরোসিন, ট্রিপটোফ্যান থাকে না। এরা তাপে জমাট বাঁধে না। উদাহরণ : স্যামন মাছের শুক্রাণুতে **সালমিন** নামক প্রোটামিন থাকে।

(vii) **স্ক্লেরোপ্রোটিন (Scleroproteins)** : এরা পানি, মৃদু লবণ দ্রবণে দ্রবণীয় নয়। প্রাণিদেহের হাড়, চুল, নখ, ত্বক, সংযোগ টিস্যুতে এই প্রোটিন বেশি থাকে। যেমন– শিং, নখ, খুর ও চুলে **কেরাটিন**; চামড়ায় **কোলাজেন** ও হাড়ে **টেনডন** এ জাতীয় প্রোটিন।

২। **যুগ্ম বা সংশ্লেষিত প্রোটিন (Conjugated proteins)** : যে প্রোটিনের সাথে কোনো অপ্রোটিন অংশ (প্রোসথেটিক গ্রুপ = prosthetic group) যুক্ত থাকে তাকে বলা হয় **কনজুগেটেড প্রোটিন** বা **যুগ্ম প্রোটিন**। কনজুগেটেড প্রোটিনকে সাধারণত নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়; যথা :

(i) **নিউক্লিওপ্রোটিন (Nucleoproteins)** : হাইড্রোলাইসিস করলে যে প্রোটিন থেকে একটি সরল প্রোটিন ও একটি নিউক্লিক অ্যাসিড পাওয়া যায় তা হলো **নিউক্লিওপ্রোটিন**। এরা পানিতে দ্রবণীয়। এদেরকে ক্রোমোসোমে পাওয়া যায়।

(ii) **গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন (Glycoproteins or Mucoproteins)** : প্রোটিনের সাথে বিভিন্ন ধরনের কার্বোহাইড্রেট (বিশেষ করে মনোস্যাকারাইড) যুক্ত হলে তাকে **গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন** বলে। সেলমেমব্রেন-এ গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন পাওয়া যায়।

(iii) **লিপোপ্রোটিন (Lipoproteins)** : এটি লিপিড ও সরল প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ। এর লিপিড অংশ গঠিত হয় কোলেস্টেরল ও ফসফোলিপিড দিয়ে। লিপিড সরল প্রোটিন অণুর সাথে সংযুক্ত থাকে। বিভিন্ন মেমব্রেনের (নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্টের ল্যামিলি, ETC) গাঠনিক উপাদান হিসাবে এরা বিরাজ করে। মানুষের রক্তের প্লাজমা প্রোটিনও লিপোপ্রোটিন জাতীয়। লিপোপ্রোটিন পানিতে দ্রবণীয়।

কাজ : গাঠনিক উপাদান হিসেবে বিভিন্ন মেমব্রেন গঠনে পূর্ণতা দান।

(iv) **ক্রোমোপ্রোটিন (Chromoproteins)** : সরল প্রোটিনে রঞ্জক পদার্থ যুক্ত হয়ে ক্রোমোপ্রোটিন সৃষ্টি করে। ফ্ল্যাভোপ্রোটিন, বিলিপ্রোটিন, ক্যারোটিনয়েড প্রোটিন, ক্লোরোফিল প্রোটিন, **হিমোগ্লোবিন প্রোটিন** ইত্যাদি হলো ক্রোমোপ্রোটিন।

(v) **মেটালোপ্রোটিন (Metaloproteins)** : অনেক এনজাইমে অ্যাক্টিভেটর হিসেবে কোনো ধাতু বা মেটাল (Fe, Mn, Mg, Zn) থাকে। ধাতু বা মেটাল সংবলিত এনজাইমগুলো হলো **মেটালোপ্রোটিন**। যেমন-সিডারোফিলিন ও সেলোপ্লাজিমিন।

(vi) **ফসফোপ্রোটিন (Phosphoproteins)** : যে সকল প্রোটিনের সাথে প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে ফসফোরিক অ্যাসিড যুক্ত থাকে তাকে **ফসফোপ্রোটিন** বলে। দুধের **কেসিনোজেন**, ডিমের **ভাইটেলিন** এ জাতীয় প্রোটিন।

(vii) **ফ্ল্যাভোপ্রোটিন (Flavoprotiens)** : এ ধরনের প্রোটিনগুলো ফ্ল্যাভিন যৌগ তথা FAD (Flavin Adenine Dinucleotide) এর সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে।

(viii) **লৌহ-প্রোফাইরিন প্রোটিন (Iron-prophyrin proteins)** : এ ধরনের প্রোটিন Iron-porphyrin যৌগ তথা সাইটোক্রোম এর সাথে যুক্ত থাকে।

৩। **উদ্ভূত বা উৎপাদিত প্রোটিন (Derived proteins)** : এসব প্রোটিন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় থাকে না। তাপের প্রভাবে এনজাইমের বা রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অথবা কৃত্রিম উপায়ে প্রোটিন অণু থেকে তৈরি হয়। উদাহরণ- পেপটাইড (Peptides), প্রোটিয়োজ (Proteoses), পেপটোন (Peptone), ফাইব্রিন ইত্যাদি। যেমন-মায়োসিন থেকে **মায়োসান** সৃষ্টি হয়। অ্যালবুমিন থেকে **অ্যালবুমাস** সৃষ্টি হয়।

আবার **গুণগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রোটিন দু'প্রকার; যথা**– (i) প্রথম শ্রেণির প্রোটিন ও (ii) দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন।

(i) প্রথম শ্রেণির প্রোটিন : যেসব প্রোটিনে সবকয়টি অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে তাদের প্রথম শ্রেণির প্রোটিন (সম্পূর্ণ প্রোটিন) বলে। যেমন– মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, বাদাম, সয়াবিনসহ অধিকাংশ প্রাণিজ প্রোটিন।

(ii) দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন : যেসব প্রোটিনে সবগুলো অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না তাদের দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন (অসম্পূর্ণ প্রোটিন) বলে। যেমন– সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল উদ্ভিজ্জ প্রোটিন।

প্রোটিনের রাসায়নিক উপাদান : বিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিডই প্রোটিনের প্রধান রাসায়নিক উপাদান। এছাড়া যুগ্ম প্রোটিনে প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে লিপিড, কার্বোহাইড্রেট, নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদি থাকে।

প্রোটিন

সরল প্রোটিন

(i) অ্যালবিউমিন
(ii) গ্লোবিউলিন
(iii) গ্লুটেনিন
(iv) প্রোল্যামিন
(v) হিস্টোন
(vi) প্রোটামিন
(vii) স্ক্লেরোপ্রোটিন

যুগ্ম প্রোটিন

(i) নিউক্লিওপ্রোটিন
(ii) গ্লাইকোপ্রোটিন
(iii) লিপোপ্রোটিন
(iv) ক্রোমোপ্রোটিন
(v) মেটালোপ্রোটিন
(vi) ফসফোপ্রোটিন
(vii) ফ্ল্যাভোপ্রোটিন
(viii) লৌহ-প্রোফাইরিন প্রোটিন

উদ্ভূত প্রোটিন

(i) মায়োসান
(ii) অ্যালবুমাস

প্রোটিনের কাজ

১। জীবদেহের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে, যেমন– কোলাজেন।
২। কোষে প্রোটিন সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে কাজ করে এবং প্রয়োজনে শক্তি উৎপাদন করে।
৩। বিভিন্ন অঙ্গাণু এবং কোষ ঝিল্লি গঠনে কাজ করে।
৪। এনজাইম হিসেবে জীবদেহের ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তথা জীবদেহকে সচল রাখে, যেমন– রুবিস্কো।
৫। অ্যান্টিবডির গাঠনিক উপাদান হিসেবে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে এবং দেহকে রোগমুক্ত রাখে, যেমন– ইমিউনোগ্লোবিউলিন।
৬। জীবদেহের প্রয়োজনীয় হরমোন উৎপন্ন করে, যেমন– ইনসুলিন।
৭। হিস্টোন প্রোটিন নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিক অ্যাসিডকে কার্যকর করে।
৮। কিছু প্রোটিন বিষাক্ত হওয়ায় অনেক জীব তা খেয়ে মারা যায় (সাপের বিষের প্রোটিন)।
৯। যে সকল উদ্ভিদে বিষাক্ত প্রোটিন থাকে তারা অনেক পশু-পাখির আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।
১০। হিমোগ্লোবিন প্রোটিন প্রাণিদেহের সমস্ত কোষে O_2 সঞ্চালন করে।
১১। মানবদেহের পেপটাইড থেকে উৎপাদিত প্রোটিন ডিফেনসিভ (defensive) অ্যান্টিবডি হিসেবে কাজ করে।
১২। পিগমেন্ট হিসেবে কাজ করে, যেমন– রোডোপসিন।
১৩। **ইন্টারফেরন** (interferon) একটি কোষীয় প্রোটিন। এটি ভাইরাস আক্রমণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেহে তৈরি হয়। ধারণা করা হচ্ছে ইন্টারফেরন ক্যান্সার ও ভাইরাসজনিত রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা যাবে।
১৪। এক গ্রাম প্রোটিন জারণে ৪.১ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।

জীবদেহে প্রোটিনের ভূমিকা (Role of Protein in Living Body)

জীবদেহ গঠনের জন্য প্রোটিন অপরিহার্য। জীবদেহে প্রোটিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

১। এনজাইমের ভূমিকা : জীবদেহের অভ্যন্তরে সংঘটিত সকল বিক্রিয়া সুনির্দিষ্ট এনজাইম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সকল এনজাইম প্রোটিন। এনজাইম জৈব অনুঘটক হিসেবে প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি করে যা জীবের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

২। ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিতে : দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধির জন্য প্রোটিন অপরিহার্য। বিভিন্ন জৈবনিক ক্রিয়াকলাপ, যেমন- শ্বসন, রেচন, জনন প্রভৃতি সম্পন্ন করার জন্য দেহের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা পূরণ করার জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন হয়।

৩। গাঠনিক ভূমিকা : তন্তুজ প্রোটিন বিভিন্ন অঙ্গের আবরণী তৈরি এবং বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে কাজ করে। কোলাজেন নামক প্রোটিন টেনডনের মূল উপাদান যা অস্থির সাথে পেশির সংযোগ স্থাপন করে।

৪। পরিবহণে : কোষ অভ্যন্তরে বিভিন্ন অণুর পরিবহণ, আয়ন স্থানান্তর প্রভৃতি প্রোটিনের মাধ্যমে ঘটে থাকে। এছাড়া **হিমোগ্লোবিন নামক প্রোটিন** প্রাণিদেহের সকল কোষ O_2 সরবরাহ করে।

৫। জীবদেহ গঠনে : জীবের বৃদ্ধি ও বিকাশ **হরমোন** দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হরমোন বিশেষ ধরনের প্রোটিন দ্বারা গঠিত। বিশেষ কয়েকটি হরমোন; যেমন– ইনসুলিন, সোমাটোট্রফিক হরমোন (STH), লিউটিট্রফিন হরমোন (LTH) ইত্যাদি।

৬। বিষক্রিয়া ও আত্মরক্ষা : বিভিন্ন জীবে বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় প্রোটিন থেকে **বিষাক্ত পদার্থ** উৎপন্ন হয়। এসব পদার্থ জীবের **আত্মরক্ষার** জন্য সহায়ক। যেমন– সাপের বিষ বা ভেনম যা সাপের আত্মরক্ষায় ব্যবহৃত হয়।

৭। ভাইরাস ও ক্যান্সার প্রতিরোধে : বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার এর কারণ হিসেবে ভাইরাস চিহ্নিত হয়েছে। **ইন্টারফেরন** নামক বিশেষ প্রোটিন ভাইরাস প্রতিরোধক হিসেবে **ব্লাড ক্যান্সার** নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

৮। অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন : অ্যান্টিবায়োটিক নানা ধরনের রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। বিপাকীয় বিক্রিয়া জীবদেহে, বিশেষ করে অণুজীবে এসব অ্যান্টিবায়োটিক উৎপন্ন হয়।

৯। ইমিউনিটি : রোগজীবাণু ধ্বংস ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পোষকদেহে যে **অ্যান্টিবডি** তৈরি হয় তাও প্রোটিন।

১০। ব্যথানাশক হিসেবে : মস্তিষ্কে উৎপন্ন **এন্ডোরফিন** ব্যথানাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১১। ঘুম সৃষ্টিতে : অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত ঘুম আনয়নকারী **s-factor** বিশেষ ধরনের প্রোটিন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রোটিওমস (Proteomes) : কোনো কোষ, টিস্যু বা জীব কর্তৃক উৎপাদিত সকল প্রোটিনের সমষ্টি হলো **প্রোটিওম।** একটি জীবের বিভিন্ন কোষ বিভিন্ন রকম প্রোটিন তৈরি করে থাকে, এমনকি একটি নির্দিষ্ট কোষও বিভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন তৈরি করে, তাই প্রোটিওম পরিবর্তনশীল (variable) অথচ জিনোম অপরিবর্তনীয়।

বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন ও তাদের কাজ

প্রোটিনের প্রকার	কাজ	উদাহরণ
গাঠনিক (structural)	গাঠনিক সাপোর্ট	চুল, টেনডন, লিগামেন্ট
আত্মরক্ষামূলক (defensive)	সংক্রমণ যোদ্ধা	অ্যান্টিবডিসমূহ
সিগনাল (signal)	বার্তাবাহক	হরমোনসমূহ
বাহক (carrier)	বস্তুর ট্রান্সপোর্ট	হিমোগ্লোবিন (O_2 ট্রান্সপোর্ট করে)
শনাক্ত ও গ্রাহক (recognition & receptor)	কোষীয় মার্কার	হিস্টোকম্প্যাটিবিলিটি কমপ্লেক্স
এনজাইম (enzyme)	ক্যাটালিস্ট	অ্যামাইলেজ
চলনশীল (mobile)	চলাচল	অ্যাকটিন এবং মায়োসিন

খাদ্য তালিকায় প্রোটিন

আমাদের খাদ্য তালিকায় প্রোটিনজাতীয় খাবার রাখা অপরিহার্য, কারণ শরীর গঠনে প্রোটিনের ভূমিকা মুখ্য। বিভিন্ন প্রকার খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ বিভিন্ন রকম। পরিমাণের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রোটিন থাকে বিভিন্ন **ডালজাতীয় খাবারে** কিন্তু এরপরও পুষ্টিবিজ্ঞানিগণ **প্রাণিজ প্রোটিনকে** প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

প্রোটিন তৈরি হয় বিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে। গাঠনিক ইউনিট হিসেবে এ বিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিডই অত্যাবশ্যকীয়। মানবদেহের চাহিদা অনুসারে মাত্র আটটি অ্যামিনো অ্যাসিড (লিউসিন, আইসোলিউসিন, লাইসিন, মেথিওনিন, থ্রিওনিন, ভ্যালিন, ফিনাইল অ্যালানিন এবং ট্রিপ্টোফ্যান)কে **অত্যাবশ্যকীয়** (essential) **অ্যামিনো অ্যাসিড** বলা হয়। এর কারণ হলো অন্য ১২টি অ্যামিনো অ্যাসিড আমাদের দেহাভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হতে পারে কিন্তু উক্ত ৮টি অ্যামিনো

অ্যাসিড দেহাভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হয় না, খাদ্যের মাধ্যমে দেহে গ্রহণ করা হয়। শিশুদের জন্য **আরজিনিন** এবং **হিস্টিডিন** অত্যাবশ্যকীয়। পূর্ণতা প্রাপ্তির আগে জন্মানো শিশুদের আরজিনিন তৈরি প্রক্রিয়ার সূচনা হয় না। তাই খাদ্যের মাধ্যমেই পূরণ করা হয়। শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড ১০টি।

সব প্রোটিনে সব অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না, তাই যেসব প্রোটিনে সবকটি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, খাদ্য তালিকায় সেগুলোই প্রাধান্য দেয়া উচিত। এদিক থেকে প্রাণিজ প্রোটিনই (মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি) **অগ্রগামী** (উৎকৃষ্ট) এবং উদ্ভিজ্জ প্রোটিন (যেমন ডাল) **অনুগামী**।

প্রকৃতপক্ষে প্রোটিনের মান বিচারে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহের উপস্থিতিই প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। অত্যাবশ্যকীয় ৮টি অ্যামিনো অ্যাসিডের একটিও **যদি মিনিমাম আদর্শ পরিমাণের চেয়ে কম থাকে তা হলেই এর মান কমে যায়**। কারণ দেহ সঠিক পরিমাণে তা শোষণ করতে পারে না। মানের দিক থেকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন পিছনে থাকার এটিই কারণ। **আদর্শ প্রোটিন পাওয়া যায় ডিম এবং দুধে। তাই এ দুটি আদর্শ খাবার**। চালের প্রোটিন এবং ডালের প্রোটিন এক সাথে হলে একটির অভাব অপরটি কিছুটা পূরণ করে, তাই চাল-ডালের খিচুড়ির পুষ্টিমান ভাত এবং ডালের চেয়ে ওপরে।

আদর্শ প্রোটিন : প্রতি ১০০ গ্রাম আদর্শ প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ (গ্রাম)

	আইসোলিউসিন	লিউসিন	লাইসিন	ফিনাইল অ্যালানিন	মেথিওনিন	থ্রিওনিন	ট্রিপ্টোফ্যান	ভ্যালিন
আদর্শ প্রোটিন	৪.৩	৪.৯	৪.৩	২.৯	২.৩	২.৯	১.৪	৪.৩
ডিম	৬.৮	৯.০	৬.৩	৬.০	৩.১	৫.০	১.৭	৭.৪
গরুর দুধ	৬.৪	৯.৯	৭.৮	৪.৯	২.৪	৪.৬	১.৪	৬.৯
মসুর ডাল	৫.২	৬.৯	৬.১	৪.১	০.৬	৩.৬	০.৮	৫.৫
মাছ	৬.৫	৯.৫	৯.০	৪.৪	৩.২	৪.৭	১.২	৬.০
মাংস	৫.২	৭.৮	৮.৬	৩.৯	২.৭	৪.৪	১.০	৫.১

বি. দ্র: ডিম এবং দুধ আদর্শ প্রোটিন। মাছ-মাংসে ট্রিপ্টোফ্যান আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম। ডালে মেথিওনিন ও ট্রিপ্টোফ্যান আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম। কাজেই মাছ-মাংসও প্রকৃত আদর্শ প্রোটিন নয়। ডালের প্রোটিন আরো নিম্নমানের।

প্রাণিজ প্রোটিন যেমন– মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডে সমৃদ্ধ হওয়ায় সারাবিশ্বে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এশিয়ান ও আফ্রিকানদের চেয়ে উত্তর আমেরিকা অনেক বেশি পরিমাণ প্রাণিজ প্রোটিন আহার করে থাকে। উন্নত দেশগুলোতে ক্যালরির ৪০%, আর উন্নয়নশীল দেশে ক্যালরির ২৩% আসে প্রাণিজ খাদ্য থেকে। সারাবিশ্বে উৎপাদিত গবাদি পশুর মাংসের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভোগ করে উত্তর আমেরিকা।

প্রোটিনের দৈনিক চাহিদা

মানবদেহের পেশি, অস্থি ও অন্যান্য গঠন এবং বিভিন্ন ধরনের জৈবরাসায়নিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রতিদিন প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। একজন সুস্থ মানুষের বয়সভিত্তিক বিভিন্ন মাত্রায় প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। নিচে মানুষের দৈনিক প্রোটিনের চাহিদার একটি তালিকা দেওয়া হলো :

৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর	১০ গ্রাম
৬–১২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর	১৯–৩৪ গ্রাম
১৩–১৯ বছর বয়স পর্যন্ত কিশোরের	৫২ গ্রাম
১৩–১৯ বছর বয়স পর্যন্ত কিশোরীর	৪৬ গ্রাম
পরিণত পুরুষের	৫৬ গ্রাম
পরিণত মহিলার	৪৬ গ্রাম
গর্ভবতী মা কিংবা প্রসূতি মহিলার	৭১ গ্রাম

লিপিড (Lipids) বা স্নেহজাতীয় পদার্থ

উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে বিদ্যমান একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থের নাম লিপিড। কার্বোহাইড্রেটের মতো লিপিডও কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে গঠিত হয়। উদ্ভিদদেহে বিশেষ করে ফল ও বীজে অধিক পরিমাণ লিপিড সঞ্চিত থাকে। **কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত স্নেহজাতীয় পদার্থকে লিপিড বলা হয়। রাসায়নিকভাবে অ্যালকোহল ও ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টারকে লিপিড বলে।** লিপিড প্রধানত চর্বি ও তেলরূপে বিদ্যমান থাকে। সাধারণ

তাপমাত্রায় কতিপয় লিপিড শক্ত থাকে এবং ২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কতিপয় লিপিড তরল থাকে। শক্ত ও কঠিন লিপিডকে **চর্বি** (fat) বা **স্নেহ** এবং তরল লিপিডকে **তেল** (oil) বলা হয়। লিপিডের নির্দিষ্ট কোনো গলনাঙ্ক নেই। প্রাণিজ চর্বি, ঘি, মাখন, দুধ লিপিডের প্রাণিজ উৎস। অপরদিকে, উদ্ভিদজগতে সরিষা, তিল, সয়াবিন, নারিকেল, সূর্যমুখী, বাদাম, অলিভ, পাম অয়েল ইত্যাদি বীজে লিপিড সঞ্চিত থাকে। আকন্দ, ভেড়ার লোম, হাঙ্গর, মৌচাক ও তিমির দেহে প্রচুর লিপিড থাকে।

লিপিড-এর বৈশিষ্ট্য

১। লিপিড বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন।
২। লিপিড পানিতে প্রায় অদ্রবণীয়।
৩। এরা ইথার, অ্যালকোহল, বেনজিন, ক্লোরোফর্ম, অ্যাসিটোন, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি দ্রবণে দ্রবণীয়।
৪। এরা ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার হিসেবে (actual or potential) বিরাজ করে।
৫। লিপিড পানির চেয়ে হালকা; তাই পানিতে ভাসে।
৬। হাইড্রোলাইসিস শেষে এরা ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারোলে পরিণত হয়।
৭। লিপিডের আণবিক ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে গলনাঙ্ক বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।
৮। লিপিডের কোনো নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক নেই।
৯। লিপিডের সাথে Sudan III দ্রবণ যোগ করলে লাল বর্ণ ধারণ করে।
১০। সাধারণ উষ্ণতায় (20°C) কিছু লিপিড (যেমন-তেল) তরল এবং কিছু লিপিড (যেমন চর্বি) কঠিন অবস্থায় থাকে।

লিপিড-এর গঠন

সাধারণভাবে গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিডের সমন্বয়ে লিপিড গঠিত হয়। ফসফোলিপিড-এ গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিড ছাড়া ফসফরাস এবং নাইট্রোজেন বেস থাকে। গ্লাইকোলিপিড-এ ফ্যাটি অ্যাসিড, শ্যুগার (হেক্সোজ) ও নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ থাকে। মোমজাতীয় লিপিড-এ গ্লিসারল-এর পরিবর্তে অ্যালকোহল বা কোলেস্টেরোল থাকে।

লিপিড-এর কাজ

১। চর্বি ও তেলজাতীয় লিপিড উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে জমা থাকে। বিভিন্ন তেলবীজের (সরিষা, তিল, সয়াবিন ইত্যাদি) অঙ্কুরোদগমকালে লিপিড খাদ্যরূপে গৃহীত হয়। এদের বিজারণকালে অধিক ATP তৈরি হয়।
২। ফসফোলিপিড বিভিন্ন মেমব্রেন গঠনে উপাদান হিসেবে কাজ করে।
৩। মোমজাতীয় লিপিড পাতার বহিরাবরণে স্তর (কিউটিকল) সৃষ্টি করে অতিরিক্ত প্রস্বেদন রোধ করে।
৪। কতিপয় এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে ফসফোলিপিড কাজ করে। এছাড়া ফসফোলিপিড আয়নের বাহক হিসেবেও কাজ করে।
৫। সালোকসংশ্লেষণে গ্লাইকোলিপিড বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
৬। প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে লিপোপ্রোটিন গঠন করে এবং লিপোপ্রোটিন শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে।

লিপিড-এর শ্রেণিবিভাগ (Classification of Lipids)

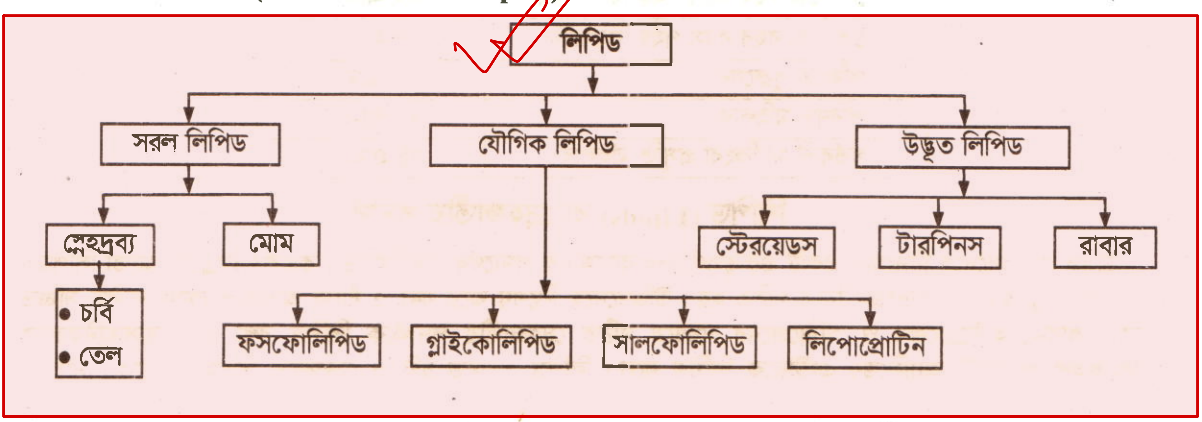

নিচে বিভিন্ন ধরনের লিপিডের বর্ণনা দেওয়া হলো :

(ক) রাসায়নিক গঠন প্রকৃতি অনুসারে লিপিড প্রধানত তিন প্রকার; যথা–

[MAT 15-16]

১। সরল লিপিড, যেমন- চর্বি, তেল, মোম ইত্যাদি; [MAT:22-23]

২। যৌগিক লিপিড, যেমন- ফসফোলিপিড, গ্লাইকোলিপিড, সালফোলিপিড ইত্যাদি;

৩। উদ্ভূত বা উৎপাদিত লিপিড, যেমন- স্টেরয়েড, টারপিনস, রাবার ইত্যাদি।

(খ) আণবিক গঠন অনুযায়ী লিপিড প্রধানত পাঁচ প্রকার; যথা–

(i) নিউট্রাল লিপিড, (ii) ফসফোলিপিড, (iii) গ্লাইকোলিপিড, (vi) টরপিনয়েডস এবং (v) মোম।

নিচে কয়েক প্রকার লিপিডের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হলো :

১। সরল লিপিড (Simple lipids) : যেসব লিপিডের বিশ্লেষণে স্নেহ পদার্থ ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না তাকে **সরল লিপিড** বলে। সরল লিপিড দু'প্রকার : (i) স্নেহদ্রব্য (চর্বি ও তেল) ও (ii) মোম।

(i) স্নেহদ্রব্য (চর্বি ও তেল) : এক অণু গ্লিসারোল ও ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টারকে বলা হয় **স্নেহদ্রব্য বা ট্রাইগ্লিসারাইড**। ট্রাইগ্লিসারাইড এক অণু গ্লিসারোল ও তিন অণু ফ্যাটি অ্যাসিড নিয়ে গঠিত। এ জাতীয় লিপিড অ্যাসিড ও ক্ষার দ্রবণে আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়, তাই এরূপ লিপিডকে **নিউট্রাল লিপিডও** বলা হয়। **ট্রাইগ্লিসারাইড** দু'রকম; যথা- চর্বি ও তেল।

চর্বি (Fat) : যেসব ট্রাইগ্লিসারাইড সম্পৃক্ত (saturated) ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে তৈরি এবং সাধারণ তাপমাত্রায় (২০° সে.) কঠিন বা অর্ধকঠিন অবস্থায় বিরাজ করে তাকে **চর্বি** বলে। যেমন– উদ্ভিজ্জ চর্বি ও পাম অয়েল। এর গলনাঙ্ক বেশি। নারিকেল তেলও চর্বিজাতীয়, নিম্ন তাপমাত্রায় জমাট বাঁধে।

তেল (Oil) : যেসব ট্রাইগ্লিসারাইড অসম্পৃক্ত (unsaturated) ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে তৈরি এবং সাধারণ তাপমাত্রায় (২০° সে.) তরল অবস্থায় থাকে তাকে **তেল** বলে। যেমন- সাধারণ ভোজ্য তেল। এর গলনাঙ্ক খুব কম।

চর্বি ও তেলের কাজ : ১। ফল ও বীজে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে জমা থাকে। ২। বীজের অঙ্কুরোদগমকালে এসব লিপিড কার্বোহাইড্রেট-এ পরিবর্তিত হয়ে বর্ধিষ্ণু চারার খাদ্য ও শক্তি যোগায়।

চর্বি ও তেল এর মধ্যে পার্থক্য

চর্বি	তেল
১। সাধারণত লম্বা শিকল ফ্যাটি অ্যাসিড ধারণ করে।	১। সাধারণত খাটো শিকল ফ্যাটি অ্যাসিড ধারণ করে।
২। সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড ধারণ করে।	২। অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড ধারণ করে।
৩। কক্ষতাপমাত্রায় (20°C) কঠিন বা অর্ধকঠিন।	৩। কক্ষতাপমাত্রায় (20°C) তরল।
৪। গলনাঙ্ক অনেক বেশি (প্রায় 70°C এর কাছাকাছি)। লরিক অ্যাসিড, স্টিয়ারিক অ্যাসিড, লিনোলিক অ্যাসিড ইত্যাদি সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড।	৪। গলনাঙ্ক অনেক কম (মাত্র 5°C এর কাছাকাছি)। অলিক অ্যাসিড, লিনোলিক অ্যাসিড ইত্যাদি।
৫। উদাহরণ- উদ্ভিজ্জ চর্বি, পাম অয়েল, নারিকেল তেল, মাখন, ঘি, প্রাণিজ চর্বি, মাছের তেল।	৫। উদাহরণ- ভোজ্য তেল।

ট্রাইগ্লিসারাইড (Triglyceride)

এক অণু গ্লিসারোল (গ্লিসারল)-এর সাথে তিন অণু ফ্যাটি অ্যাসিড সংযুক্ত হয়ে তৈরি হয় এক অণু ট্রাইগ্লিসারাইড। এ সময় তিন অণু পানি তৈরি হয়, কাজেই এটি হলো একটি **ডিহাইড্রেশন** বিক্রিয়া। **গ্লিসারোল** হলো একটি ক্ষুদ্র অণুর অ্যালকোহল যেখানে ৩টি কার্বন ও ৩টি হাইড্রোক্সি পার্শ্বগ্রুপ থাকে। **ফ্যাটি অ্যাসিড** হলো একটি হাইড্রোকার্বন চেইন যার এক মাথায় একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ থাকে। কার্বোক্সিল গ্রুপের ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে OH সাইড গ্রুপের সংযোগকে বলা হয় **এস্টার লিংকেজ** (ester linkage)। ফ্যাটি অ্যাসিড চেইন-এ কোনো ডাবল বন্ড না থাকলে তাকে বলা হয় **স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড**, যেমন- স্টিয়ারিক অ্যাসিড। ফ্যাটি অ্যাসিডের হাইড্রোকার্বন চেইন-এ এক বা একাধিক ডাবল বন্ড থাকলে তাকে বলা হয় **আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড**, যেমন– লিনোলিক (linoleic) অ্যাসিড, লিনোলেনিক (linolenic) অ্যাসিড। স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড (যা প্রাণী চর্বিতে থাকে) আর্টারিগাত্রে জমা হয়ে রক্ত চলাচলের পথ সরু করে দেয়, তাই হৃদরোগ হয়। আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডে তা হয় না।

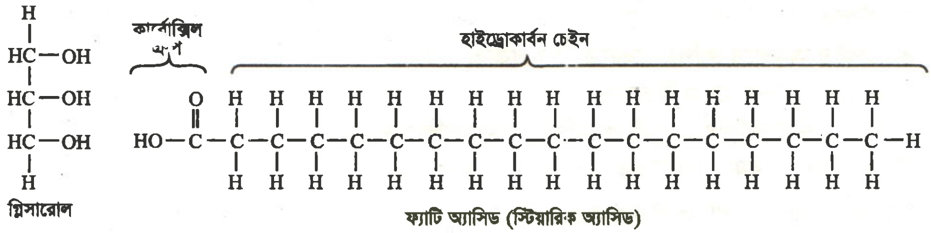

গ্লিসারোল এবং একটি ফ্যাটি অ্যাসিড।

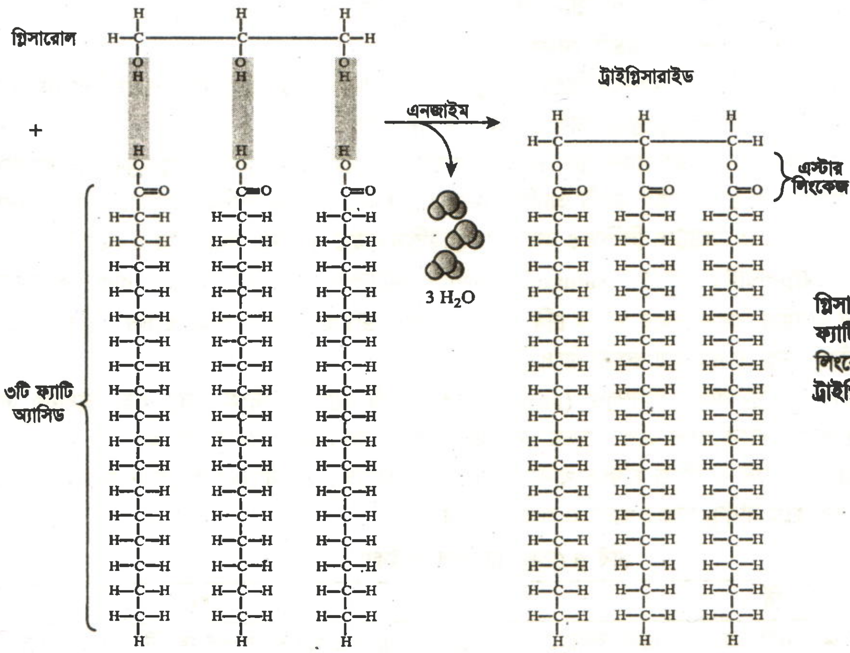

গ্লিসারোলের সাথে তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার লিংকেজ সংযুক্তির মাধ্যমে ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি।

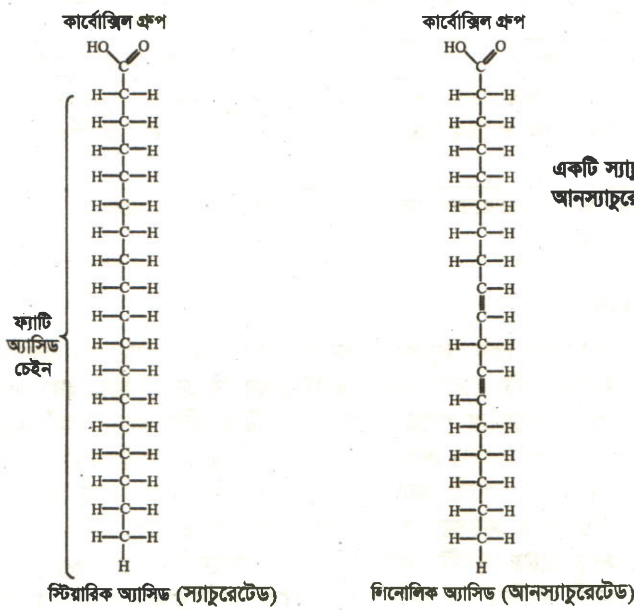

একটি স্যাচুরেটেড ও একটি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড।

বি. দ্র. গঠন শিক্ষার্থীর বোঝার জন্য, মুখস্থ করার দরকার নেই।

মানুষ (এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী) ফ্যাটি অ্যাসিডের নবম কার্বনের পর কোনো ডাবল বন্ড তৈরি করতে পারে না, তাই আমাদের খাদ্যে সামান্য আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড যোগ করতে হয়। এ জন্যই linoleic এবং linolenic অ্যাসিডদ্বয়কে **আবশ্যকীয়** (essential) **ফ্যাটি অ্যাসিড** বলা হয়। আমাদের খাদ্যে সাধারণত যথেষ্ট আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, তাই পুষ্টিজনিত অসুবিধা দেখা দেয় না।

সিজ এবং ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড : ফ্যাটি অ্যাসিডের দুটি কার্বন এটমের মধ্যকার ডবল বন্ডের হাইড্রোজেন একই দিকে থাকলে তাকে বলা হয় Cis-fatty acid; আর ডবল বন্ডের দুটি হাইড্রোজেন একটি অপরটির উল্টো দিকে থাকলে তা হলো trans-fatty acid।

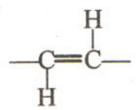

ট্রান্স-ফ্যাটি অ্যাসিড

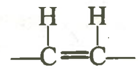

সিজ-ফ্যাটি অ্যাসিড

ফ্যাটি অ্যাসিডের শেষ CH_3 এর পর ৩নং কার্বনে ডবল বন্ড থাকলে তা হলো **ওমেগা-3** এবং ৬নং কার্বনে ডবল বন্ড থাকলে তা হলো **ওমেগা-6**। ওমেগা-3 এবং ওমেগা-6 অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি অ্যাসিড, দেহে তৈরি হয় না, খাদ্যের সাথে গ্রহণ করতে হয়। ব্রেইন ও চোখের গঠনে অধিক প্রয়োজন হয়। সিজ-ফ্যাটি অ্যাসিড, যেমন- অলিভ অয়েল, দেহের জন্য উপকারী এবং ট্রান্স-ফ্যাটি অ্যাসিড দেহের জন্য অপকারী।

(ii) মোম (Wax) : ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহলের পরিবর্তে মনোহাইড্রিক অ্যালকোহলবিশিষ্ট উপাদানের সাথে এস্টারিভূত হলে তাকে **মোম** বলে। কোনো কোনো উদ্ভিদে প্রাপ্ত এক অণু মোমে ২৪ থেকে ৩৬টি কার্বন পরমাণু থাকে। মৌচাক থেকেও প্রাকৃতিক মোম পাওয়া যায়। সাধারণ তাপমাত্রায় মোম কঠিন থাকে। মোম পানিতে অদ্রবণীয় এবং অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে তৈরি। রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়, কারণ এদের হাইড্রোকার্বন চেইন-এ কোনো ডবল বন্ড থাকে না। এদের চেইন অত্যন্ত দীর্ঘকায়। ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিসর C_{14} থেকে C_{36}। আর অ্যালকোহলের পরিসর C_{16} থেকে C_{36}।

মোম-এর কাজ : ১। উদ্ভিদ অঙ্গের উপরিতলে প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। ২। মোম সাধারণত কাণ্ড, বোঁটা, পাতা ও ফলের ওপর প্রতিরোধক স্তর হিসেবে অবস্থান করে। ৩। উদ্ভিদ কোষ প্রাচীরের কিউটিন ও সুবেরিন মোমজাতীয় পদার্থ। ৪। মোম থেকে মোমবাতি তৈরি হয়। ৫। বিভিন্ন প্রসাধন শিল্পেও মোম ব্যবহৃত হয়।

২। যৌগিক লিপিড (Compound lipids) : যে লিপিড সরল লিপিডের সাথে কিছু জৈব ও অজৈব পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরি হয় তাকে **যৌগিক লিপিড** বলে। এটি স্নেহ ও অস্নেহ জাতীয় পদার্থের যৌগ। চার প্রকার যৌগিক লিপিড নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

(i) ফসফোলিপিড (Phospholipids) : গ্লিসারোল, ফ্যাটি অ্যাসিড ও ফসফেটের সমন্বয়ে গঠিত লিপিডকে বলা হয় **ফসফোলিপিড**। লেসিথিন (lecithin), সেফালিন (cephalin), প্লাজমালোজেন (plasmalogen) ইত্যাদি কয়েকটি ফসফোলিপিডের নাম। ফসফোলিপিড-এর বিশেষ উপাদান হলো ফসফোটাইডিক অ্যাসিড। সেল মেমব্রেন, মাইটোকন্ড্রিয়া, টনোপ্লাস্ট, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, নিউক্লিয়ার এনভেলপ ইত্যাদি ফসফোলিপিড সম্বলিত।

কাজ : ১। কোষ ঝিল্লি, বিভিন্ন কোষ অঙ্গাণুর ঝিল্লির গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। ২। আয়ন বাহক হিসেবে কাজ করে। ৩। কতিপয় এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে কাজ করে। ৪। ফসফোলিপিড রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। ৫। কোষের ভেদ্যতা ও পরিবহণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ৬। উদ্ভিজ্জ তেল ফসফোলিপিড সমৃদ্ধ।

(ii) গ্লাইকোলিপিড (Glycolipids) : সরল লিপিডের সাথে যখন কার্বোহাইড্রেট যুক্ত থাকে তখন তাকে **গ্লাইকোলিপিড** বলে। এতে ফসফেটের পরিবর্তে গ্যালাকটোজ বা গ্লুকোজ থাকে। উদ্ভিদের ফটোসিনথেটিক অঙ্গে ফসফোলিপিড অপেক্ষা গ্লাইকোলিপিড বেশি থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের মেমব্রেনে গ্লাইকোলিপিড অধিক থাকে। এতে গ্যালাকটোজ থাকলে তাকে গ্যালাকটোলিপিড বলে। সূর্যমুখী ও তুলার বীজ থেকে গ্লাইকোলিপিড শনাক্ত করা হয়েছে। গ্লাইকোপ্রোটিন ও গ্লাইকোলিপিডকে মিলিতভাবে গ্লাইকোক্যালিক্স বলা হয়। লিপিডের সাথে গ্যালাক্টোজ যুক্ত থাকলে তাকে গ্যালাক্টোলিপিড বলে।

কাজ : ১। ফটোসিনথেটিক অঙ্গাণু গঠনে ভূমিকা রাখা। ২। ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা।

(iii) সালফোলিপিড (Sulpholipids) : যে গ্লাইকোলিপিডে সালফার থাকে তাকে সালফোলিপিড বলে। উদ্ভিদে প্রচুর পরিমাণ এ জৈব যৌগটি পাওয়া যায়। ক্লোরোপ্লাস্টে এর উপস্থিতি সীমাবদ্ধ থাকে।

(iv) লিপোপ্রোটিন (Lipoprotein) : লিপিডের সাথে প্রোটিন যুক্ত হয়ে যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ গঠন করে তাকে **লিপোপ্রোটিন** বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের লিপিড অংশ কোলেস্টেরল, এস্টার এবং ফসফোলিপিড দিয়ে গঠিত থাকে। কোষের মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্ট আবরণীতে লিপোপ্রোটিন থাকে।

কাজ : ১। কোষ অঙ্গাণুর গাঠনিক উপাদান হিসেবে বিদ্যমান। ২। লিপোপ্রোটিন মাইটোকন্ড্রিয়াতে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন (ETC)-এর সাথে জড়িত থেকে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে।

লিপিড প্রোফাইল

রক্তে কোলেস্টেরল ও চর্বির মাত্রা দেখতে লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষাটি করা হয়। লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষায় টোটাল কোলেস্টেরল (TC), লো-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন (LDL), হাই-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন (HDL) ও ট্রাইগ্লিসারাইড (TG) এর মাত্রা দেখা হয়। নিচের ছক থেকে সহজেই লিপিড প্রোফাইল (mg/dl = milligram/deciliter) সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

American Heart Association, NEF III Guideline

Total cholesterol	:	Desirable <200 mg/dl;	Borderline200–239;	High > 240	
HDL	:	Desirable > 40 mg/dl			
LDL	:	Optimal < 100 mg/dl ;	Borderline 130–159;	High > 160	
Triglyceride	:	Normal < 150 mg/dl ;	Borderline 150-199;	High >200 – 499;	Veryhigh > 500

৩। **উদ্ভূত বা উৎপাদিত লিপিড (Derived lipids) :** যৌগিক লিপিডের আর্দ্র বিশ্লেষণের ফলে যে লিপিড উদ্ভূত হয় তাকে **উদ্ভূত লিপিড** বলে। আবার **যেসব যৌগ আইসোপ্রিন এককের (C_5H_8) পলিমার দিয়ে গঠিত তাকে টারপিনয়েড লিপিড** বলে। আইসোপ্রিন হলো ৫ কার্বনবিশিষ্ট যৌগ। স্টেরয়েড, টারপিন, রাবার ইত্যাদি টারপিনয়েড লিপিডের উদাহরণ। টারপিনয়েড লিপিড তিন প্রকার; যথা :

(i) স্টেরয়েডস (Steroids) : চারটি ভিন্নতর কার্বন রিং-এর শিরদাঁড়া (backbone) এবং তাতে কার্বনের পার্শ্বশিকল নিয়ে গঠিত লিপিড হলো স্টেরয়েড। যেসব স্টেরয়েড-এ এক বা একাধিক হাইড্রক্সিল (–OH) গ্রুপ থাকে তাদেরকে বলা হয় **স্টেরল** (sterol)। ব্যাকটেরিয়া ও সায়ানোব্যাকটেরিয়া ছাড়া অন্যান্য উদ্ভিদে স্টেরল বিদ্যমান। এরা উদ্ভিদে মুক্ত অবস্থায় অথবা গ্লাইকোসাইড হিসেবে বিরাজমান থাকে। কোলেস্টেরল (cholesterol), স্টিগমাস্টেরল (stigmasterol), আর্গোস্টেরল (ergosterol), β-সিস্টোস্টেরল (β-sistosterol), ডিজিট্যালিন প্রভৃতি স্টেরয়েডস্ এর উদাহরণ। হৃদপিণ্ডের চিকিৎসায় **ডিজিটালিন** ব্যবহৃত হয়। নিউরোস্পোরা ও ঈস্ট এ আর্গোস্টেরল পাওয়া যায়। আলু, চুপরিআলুতে সর্বোচ্চ পরিমাণে কোলেস্টেরল পাওয়া যায়। অধিক পরিমাণ কোলেস্টেরল প্রাণিদেহে পাওয়া যায়।

কোলেস্টেরল : কোলেস্টেরল হলো সকল প্রাণীর চর্বিতে বিদ্যমান একটি সাধারণ স্টেরল যা প্লাজমামেমব্রেনের অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান, পিত্তের প্রধান উপাদান এবং ভিটামিন-ডি এর পূর্বসূচক।

কোলেস্টেরল দুই প্রকার; যথা– (i) লো-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন বা **LDL** এবং (ii) **হাই-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন** বা **HDL**। মানুষের রক্তে কোলেস্টেরল বেশি থাকা ক্ষতিকর (রক্তে স্বাভাবিকমাত্রা ০.১৫–১.২০%)। রক্তে HDL বেশি থাকা মন্দ নয় তবে LDL বেশি থাকা খুবই ক্ষতিকর। স্ত্রীলোকের রক্তে HDL বেশি থাকে এবং LDL কম থাকে। এজন্য পুরুষ লোক অপেক্ষা স্ত্রীলোকের হৃদরোগ কম হয়। কোলেস্টেরল এর মাত্রা বেশি থাকলে রক্তনালি সরু হয়ে হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচল কমে যায়। ফলে করোনারি থ্রম্বোসিস নামক হৃদরোগ হয়। রক্তে অতিমাত্রায় কোলেস্টেরল ধমনীর লুমেন (ছিদ্র) বন্ধ করে দিতে পারে। মানুষের রক্তে HDL এর মাত্রা বেশি (>40 mg/dl) থাকা ভালো। তবে LDL এর মাত্রা কম (<100 mg/dl) থাকা ভালো।

[MAT: 22-23]

কাজ : বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসায় স্টেরয়েড ব্যবহৃত হয়। কিছু স্টেরয়েড হরমোন প্রাণীর যৌন বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রোটিন ও চর্বি হজম, পানির ভারসাম্য রক্ষা, কোষ পর্দা গঠন প্রভৃতি কাজ বিভিন্ন প্রকার স্টেরয়েড করে থাকে।

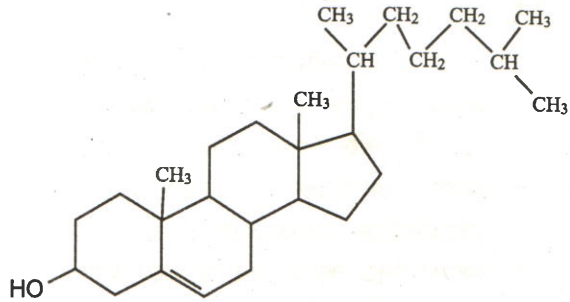

কোলেস্টেরল এর গঠন।

(ii) টারপিন্‌স (Terpenes) : ১০ থেকে ৪০টি কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট আইসোপ্রিনয়েড যৌগকে টারপিন্‌স বলে। এর সাধারণ সংকেত হলো $(C_5H_8)n$। পুদিনা, তুলসী ইত্যাদিতে উদ্বায়ী তেল হিসেবে টারপিন্‌স পাওয়া যায়।

কাজ : সুগন্ধী প্রসাধনী সামগ্রী তৈরিতে ও বার্নিশের কাজে ব্যবহৃত হয়।

(iii) রাবার (Rubber) : প্রায় ৩০০০–৬০০০ হাজার আইসোপ্রিন একক যুক্ত হয়ে রাবার তৈরি হয়। *Hevea brasiliensis* (Euphorbiaceae) থেকে প্রাকৃতিক রাবার (প্যারা রাবার) পাওয়া যায়। এছাড়া *Ficus elastica* (ভারতীয় রাবার), *Palaquium gutta*, *Castilla elastica* ইত্যাদি বৃক্ষের কষ থেকেও সামান্য পরিমাণ রাবার সংগ্রহ করা যায়। প্রাকৃতিক রাবার ছাড়াও কৃত্রিম উপায়ে রাবার উৎপাদন করা হয়। এদেরকে গাম রাবার বলে। বিশ্বের প্রায় ৮০% শিল্পের সাথে রাবার জড়িত।

ব্যবহার : ট্রাক, বাস, মোটরগাড়ি, রিক্সা, সাইকেল ইত্যাদির টায়ার তৈরি করার জন্য রাবার ব্যবহৃত হয়। খেলনা, আঠা, ইরেজার, গ্লাভস ইত্যাদি তৈরিতে-ও ব্যবহৃত হয়।

লিপিড-এর রাসায়নিক উপাদান

লিপিড সাধারণত কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে গঠিত। এতে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারোল ছাড়া ফসফরাস ও নাইট্রোজেন ক্ষারকও থাকতে পারে। মোমে গ্লিসারোল থাকেনা - এর পরিবর্তে অ্যালকোহল বা কোলেস্টেরল থাকে। গ্লাইকোলিপিডে ফ্যাটি অ্যাসিড, হেক্সোজ শ্যুগার ও নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ থাকে।

ভিন্নধর্মী লিপিড

কিছু লিপিডের রাসায়নিক গঠন ট্রাইগ্লিসারাইড্‌স ও ফসফোলিপিড থেকে আলাদা। নিচে এর কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

- **ক্যারোটিনয়েড্‌স (Carotenoids) :** এরা আলোক শোষণকারী পিগমেন্ট। বিটা-ক্যারোটিন পাতায় আলোকশক্তি শোষণ করে সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করে। এছাড়া বিটা-ক্যারোটিন আলোক অনুধাবন করে **ফটোট্রপিজম** ঘটায়। মানবদেহে বিটা-ক্যারোটিন ভেঙ্গে দুই অণু **ভিটামিন-এ** তৈরি করে যা থেকে পরে **রডোপসিন** (rhodopsin) তৈরি হয়। রডোপসিন দৃষ্টিশক্তি (vision) দান করে। ডিমের কুসুম, গাজর, টমেটো ইত্যাদি থেকে বিটা ক্যারোটিন পাওয়া যায়।

- **স্টেরয়েড্‌স (Steroids) :** Testosterone এবং Estrogen হলো স্টেরয়েড হরমোন যা মেরুদণ্ডী প্রাণীতে যৌন বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। Cortisol কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন হজম, লবণ ভারসাম্য, পানি ভারসাম্য এবং যৌন বিকাশে অবদান রাখে। Cholesterol লিভারে তৈরি হয় এবং কোষীয় ঝিল্লির গঠনে সাহায্য করে, Testosterone এবং অন্যান্য স্টেরয়েড হরমোন সৃষ্টির সূচনা দ্রব্য হিসেবে কাজ করে। Bile salt তৈরিতেও সাহায্য করে যা খাদ্যের চর্বি হজমে অবদান রাখে। রক্তে অতিমাত্রায় কোলেস্টেরল ধমনীর লুমেন বন্ধ করে দিতে পারে। রক্তে LDL (Low Density Lipoprotein) বেশি থাকা ক্ষতিকর কিন্তু HDL (High Density Lipoprotein) বেশি থাকা মঙ্গলজনক।

ভিটামিনসমূহ (Vitamins) : ক্যারোটিনয়েড এবং স্টেরয়েড-এর মতো কতক ভিটামিনও আইসোপ্রিন (isoprene)-এর রাসায়নিক পরিবর্তন ও কোভেলেন্ট লিংকিং-এর মাধ্যমে তৈরি হয়। ক্যারোটিনয়েড থেকে **ভিটামিন-A** তৈরি হয়। এর অভাব হলে ত্বক শুষ্ক হয়, রাতকানা রোগ হয় এবং বৃদ্ধি রহিত হয়। **ভিটামিন-D** অন্ত্র থেকে ক্যালসিয়াম শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে। এর অভাবে হাড়জনিত বিভিন্ন রোগ হয়। এক দল লিপিড **ভিটামিন-E** হিসেবে পরিচিত। এরা জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার ক্ষতিকর দিক থেকে কোষকে রক্ষা করে। **ভিটামিন-K** সবুজ শাকসবজিতে পাওয়া যায়। আবার অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়াও তৈরি করে।

এরা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন হলো B ও C এবং পানিতে অদ্রবণীয় ভিটামিন হলো A, D, E ও K।

জীবদেহে লিপিডের ভূমিকা (Role of Lipids in Living Body)

* লিপিড জীবদেহে খাদ্য হিসেবে **সঞ্চিত** থাকে। বীজের শস্যে লিপিড জমা থাকে এবং অঙ্কুরোদগমের সময় প্রয়োজনীয় **শক্তি** সরবরাহ করে।
* কোষঝিল্লি থেকে শুরু করে অধিকাংশ কোষ অঙ্গাণুর আবরণী ফসফোলিপিড দিয়ে গঠিত।
* গ্লাইকোলিপিড সালোকসংশ্লেষণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
* ফসফোলিপিড কোষের **আয়নের বাহক** হিসেবেও কাজ করে।
* পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন হলো B ও C এবং পানিতে অদ্রবণীয় ভিটামিন হলো A, D, E ও K।
* ফসফোলিপিড জীবদেহের কতিপয় উৎসেচকের (এনজাইম) **প্রোস্থেটিক গ্রুপ** হিসেবে কাজ করে।
* প্রাণিদেহের ত্বকের নিচে সঞ্চিত চর্বি **তাপ নিরোধক** হিসেবে কাজ করে।
* মোমজাতীয় কিছু লিপিড উদ্ভিদের কাণ্ড ও কিউটিকলে বিদ্যমান থেকে **প্রস্বেদনের হার** হ্রাস করে।
* **টারপিনসজাতীয় লিপিড উদ্ভিদে সুগন্ধি সৃষ্টি করে।**
* লিপিড থেকে সামান্য প্রোটিন (লিপোপ্রোটিন), হরমোন এবং কোলেস্টেরল সংশ্লেষিত হয়।

প্রধান প্রধান লিপিড-এর প্রকার, গঠন ও কাজ

প্রকার	গঠন	কাজ	উদাহরণ
১। ফ্যাটি অ্যাসিড	হাইড্রোকার্বন চেইনের সাথে কার্বোক্সিল গ্রুপ সংযুক্ত।	কোষীয় কাজ এবং শক্তি সঞ্চয়	স্টিয়ারিক অ্যাসিড
২। ফ্যাট	গ্লিসারোলের সাথে ৩টি ফ্যাটি অ্যাসিড সংযুক্ত।	শক্তি সঞ্চয় এবং ইনসুলেশন	বাটার
৩। ফসফোলিপিড	২টি ফ্যাটি অ্যাসিড চেইন এবং ১টি ফসফেট গ্রুপ গ্লিসারোলের সাথে সংযুক্ত।	কোষঝিল্লি গঠন	লিপিড বাইলেয়ার
৪। স্টেরয়েড	চারকার্বন রিংবিশিষ্ট।	হর্মোনাল সিগনালিং, বৃদ্ধি, পরিবেশের প্রতি কোষের সাড়া প্রদান	কোলেস্টেরল, টেস্টোস্টেরন
৫। ওয়াক্স	লম্বা ফ্যাটি অ্যাসিড চেইন অ্যালকোহল বা কার্বন রিং-এর সাথে সংযুক্ত।	পানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা দান	পাতা, কাণ্ড ও ফলে মোমের আস্তর

এনজাইম (Enzyme) বা উৎসেচক

এনজাইম হলো প্রোটিনজাতীয় পদার্থ। জীবকোষে এনজাইম অতি অল্পমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এনজাইম বিভিন্ন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে এবং বিক্রিয়া শেষে অপরিবর্তিতভাবে মুক্ত হয়ে যায়। বলা হয় জীবনতন্ত্রের (living system) গতিময় প্রাণ-রাসায়নিক অবস্থা বহুলাংশে এনজাইম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। বিজ্ঞানী কুন (F. H. Kuhne) ১৮৭৮ সালে সর্বপ্রথম এনজাইম শব্দটি ব্যবহার করেন। **ঈস্ট কোষে জাইমেজ** আবিষ্কৃত হয় ১৮৯৭ সালে। সামনার (James Sumner, 1926) প্রথম **ইউরিয়েজ** (urease) নামক এনজাইমটি কোষ হতে পৃথক করেন এবং বলেন যে, "enzymes are proteins"। এডওয়ার্ড বুচনার চিনির ফার্মেন্টেশনের জন্য পদার্থকে এনজাইম হিসেবে শনাক্ত করেন। **যে প্রোটিন জীবদেহে অল্পমাত্রায় বিদ্যমান থেকে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়ার পর নিজেরা মুক্ত ও অপরিবর্তিত** (শর্ত সাপেক্ষে) **থাকে, তাকে এনজাইম বলে।** এনজাইমকে জৈব **অনুঘটকও** (organic catalyst) বলা হয়ে থাকে। এনজাইম কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সালফার মৌলে গঠিত। কিছু কিছু এনজাইমে ফসফরাস, তামা, দস্তা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি মৌল থাকে বলে জানা গেছে।

এনজাইমের ভৌত বৈশিষ্ট্য বা এনজাইমের ধর্ম

১। এনজাইম হলো প্রধানত প্রোটিনধর্মী। [MAT: 22-23]

২। জীবকোষে এনজাইম কলয়েড (colloid) রূপে অবস্থান করে।

৩। এর কার্যকারিতা pH দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সকল এনজাইমই pH 6-9 এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল।

৪। এরা তাপ প্রবণ (heat sensitive) অর্থাৎ সাধারণত 35°C – 40°C তাপমাত্রায় অধিক ক্রিয়াশীল। অধিক তাপে এনজাইম বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কম তাপে নষ্ট হয় না।

৫। এনজাইম খুব অল্প মাত্রায় বিদ্যমান থেকে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে।

৬। এনজাইম কেবলমাত্র বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থার (state of equilibrium) পরিবর্তন করে না।

৭। এনজাইমের কার্যকারিতা সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট এনজাইম শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট বিক্রিয়া বা নির্দিষ্ট বিক্রিয়া গ্রুপকে প্রভাবিত করে, অন্য বিক্রিয়াকে নয়।

৮। এনজাইম শুধু জীবিত কোষই উৎপন্ন হয় এবং কার্যকারিতার জন্য এদের পানির প্রয়োজন হয়।

৯। প্রায় সব এনজাইম পানিতে দ্রবণীয়।

১০। প্রখর আলোর (অতিবেগুনি রশ্মি) প্রভাবে এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয়।

এনজাইমের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য : সব এনজাইমই প্রোটিনজাতীয়, তাই প্রোটিন গঠনকারী অ্যামিনো অ্যাসিডই এনজাইমসমূহের মূল গাঠনিক উপাদান। একটি সুনির্দিষ্ট এনজাইমের অ্যামিনো অ্যাসিড সংখ্যা ও অনুক্রম সুনির্দিষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন এনজাইমের অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা ও অনুক্রম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এনজাইম অম্লীয় ও ক্ষারীয় উভয় পরিবেশেই ক্রিয়াশীল। কো-এনজাইম, কো-ফ্যাক্টর ইত্যাদির উপস্থিতিতে এনজাইমের ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। এনজাইম সাধারণত পানি, গ্লিসারোল ও লঘু অ্যালকোহলে দ্রবণীয়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সব প্রোটিনই এনজাইম নয়। অ্যামোনিয়াম সালফেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড, পিকরিক অ্যাসিড ইত্যাদির দ্বারা এনজাইম অধঃক্ষেপিত হয়। উচ্চ তাপ (50–100°C), অতি বেগুনি রশ্মি ইত্যাদির প্রভাবে এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

এনজাইমের নামকরণ : সাধারণত তিনটি পৃথক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে এনজাইমের নামকরণ করা হয়। যথা– ১। সাবস্ট্রেট এর ধরন অনুসারে, ২। বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে এবং ৩। সাবস্ট্রেট-বিক্রিয়ার মিলিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে।

১। **সাবস্ট্রেট-এর ধরন অনুসারে :** এনজাইম যার ওপর ক্রিয়া করে তাকে বলা হয় **সাবস্ট্রেট** (substrate)। যে সাবস্ট্রেট তথা যে পদার্থের ওপর এনজাইম ক্রিয়া করে তার শেষে- **'এজ'** (ase) যোগ করে এনজাইমের নামকরণ করা হয়। যেমন–

	সাবস্ট্রেট		এনজাইম
(i)	সুকরোজ-এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	সুকরেজ
(ii)	ইউরিয়া-এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	ইউরিয়েজ
(iii)	আরজিনিন-এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	আরজিনেজ
(iv)	টাইরোসিন-এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	টাইরোসিনেজ
(v)	লিপিড-এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	লাইপেজ
(vi)	প্রোটিন-এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	প্রোটিয়েজ

২। **বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে :** এনজাইম যে ধরনের বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত বা প্রভাবিত করে সেই বিক্রিয়ার নামের প্রথমাংশের সাথে **'এজ'** যোগ করে এনজাইমের নামকরণ করা হয়। একটি ছকের মাধ্যমে এটি দেখানো হলো।

বিক্রিয়ার নাম	+ এজ	এনজাইমের নাম
হাইড্রোলাইসিস	+ এজ	= হাইড্রোলেজ
অক্সিডেশন	+ এজ	= অক্সিডেজ
রিডাকশন	+ এজ	= রিডাকটেজ

RMDAC

৩। **সাবস্ট্রেট-বিক্রিয়ার মিলিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে :** সাবস্ট্রেটের সাথে এনজাইমের নাম যোগ করে এ জাতীয় নামকরণ করা হয়। সাধারণত বিক্রিয়াকে নির্দিষ্ট করে বোঝাতে এ জাতীয় নামকরণ করা হয়। যেমন সাবস্ট্রেট হেক্সোজ (গ্লুকোজ) এবং এনজাইম কাইনেজ, তাই যুক্ত নাম দেয়া হয়েছে **হেক্সোকাইনেজ**। গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ-৬-ফসফেট সৃষ্টিকালে এ এনজাইম কার্যকরী হয়। ফসফোইনল পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরির বিক্রিয়ার এনজাইমের নাম **পাইরুভিক অ্যাসিড কাইনেজ**। এমনইভাবে ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ, ফসফোগ্লুকো-আইসোমারেজ ইত্যাদি।

প্রোসথেটিক গ্রুপ; কো-ফ্যাক্টর, কো-এনজাইম

- সব এনজাইমই প্রোটিন। যে এনজাইম শুধু প্রোটিন দিয়ে গঠিত তাকে বলা হয় **সরল এনজাইম**।
- কোনো কোনো এনজাইমে প্রোটিন অংশের সাথে একটি অপ্রোটিন অংশ সংযুক্ত থাকে। এ ধরনের এনজাইমকে (তথা প্রোটিনকে) বলা হয় **কনজুগেটেড প্রোটিন** (conjugated proteins).
- কনজুগেটেড প্রোটিন এর প্রোটিন অংশকে **অ্যাপোএনজাইম** (apoenzyme) বলে।
- কনজুগেটেড প্রোটিনের নন-প্রোটিন বা অপ্রোটিন অংশকে **প্রোসথেটিক গ্রুপ বলে**। (অর্থাৎ, প্রোটিনযুক্ত অংশের সাথে যে অপ্রোটিন অংশ যুক্ত থাকে তাকে প্রোসথেটিক গ্রুপ বলে।)
- এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপটি কোনো ধাতুর আয়ন **মেটাল** (metal) হলে তাকে **কো-ফ্যাক্টর** (co-factor) বলা হয়। পূর্বে এদেরকে **অ্যাক্টিভেটর** বলা হতো, যেমন- Fe^{2+}, Mg^{2+}, Zn^{2+} প্রভৃতি।

কো-এনজাইম (Co-enzymes)

এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপটি কোনো জৈব রাসায়নিক পদার্থ হলে (organic compound) তাকে **কো-এনজাইম** (co-enzyme) বলা হয়; যেমন- FAD, NAD, ATP ইত্যাদি।

এনজাইমেটিক ক্রিয়াকালে কো-এনজাইম সাধারণত সাবস্ট্রেট হতে যে এটম বিয়োজন হয় তার গ্রহীতা (acceptor) হিসেবে বা সাবস্ট্রেট-এর সাথে যে এটম যোগ হয় তার দাতা (donor) হিসেবে কাজ করে। এনজাইম হতে কো-এনজাইম অংশ পৃথক করে নিলে এনজাইমের কার্যক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কো-এনজাইম হলো–

(i) FAD. = Flavin Adenine Dinucleotide : এটি ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের সাথে কাজ করে এবং যৌগ হতে হাইড্রোজেন বিমুক্ত ও গ্রহণ করে $FADH_2$ তে পরিণত করে।

$FADH_2$ = Reduced Flavin Adenine Dinucleotide

(ii) FMN = Flavin Mononucleotide (ভিটামিন B_2-মনোফসফেট)।

(iii) NAD = Nicotinamide Adenine Dinucleotide : এটি ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের সাথে কাজ করে এবং যৌগ হতে হাইড্রোজেন বিমুক্ত ও গ্রহণ করে $NADH + H^+$ তে পরিণত করে।

$NADH + H^+$ = Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide

(iv) NADP = Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate

$NADPH + H^+$ = Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate

(v) Co-A = Co-enzyme A : ভিটামিন-B, পাইরোফসফেট ও অ্যাডিনাইলিক অ্যাসিড নিয়ে কো-এনজাইম-A গঠিত। ফ্যাটি অ্যাসিড বিপাক, সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র, স্টেরল ও অ্যাসিটিল কোলিন সংশ্লেষণে Co-A বিশেষভাবে কাজ করে।

(vi) ATP = Adenosine Triphosphate : এক অণু অ্যাডেনিন, এক অণু রাইবোজ শর্করা এবং তিন অণু ফসফেট নিয়ে ATP গঠিত। এরা কোষের বিভিন্ন ধরনের বিপাক ক্রিয়ায় শক্তি সরবরাহ করে।

এনজাইমের কাজের কৌশল (Mechanism of enzyme action) বা কর্মপদ্ধতি

কোনো নির্দিষ্ট এনজাইমের এক বা একাধিক **সক্রিয় স্থান বা অ্যাকটিভ সাইট** (active site) থাকে। জার্মান রসায়নবিদ Emil Fischer (১৮৯৪) এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট প্রস্তাব করেন। পলিপেপটাইড চেইনের ফোল্ডিং-এর মাধ্যমে অ্যাকটিভ সাইট সৃষ্টি হয়। অ্যাকটিভ সাইট ও সাবস্ট্রেটের সম্পর্ক হলো **তালা-চাবির মতো** সুনির্দিষ্ট। (১) প্রথমে সাবস্ট্রেট

অণু এনজাইমের সক্রিয় স্থান তথা **'অ্যাকটিভ সাইট'**-এ সংযুক্ত হয়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ সৃষ্টি করে। (২) দ্বিতীয় পর্যায়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ ভেঙে গিয়ে নতুন পদার্থ সৃষ্টি হয় এবং এনজাইম অপরিবর্তিতভাবে পৃথক হয়ে যায়।

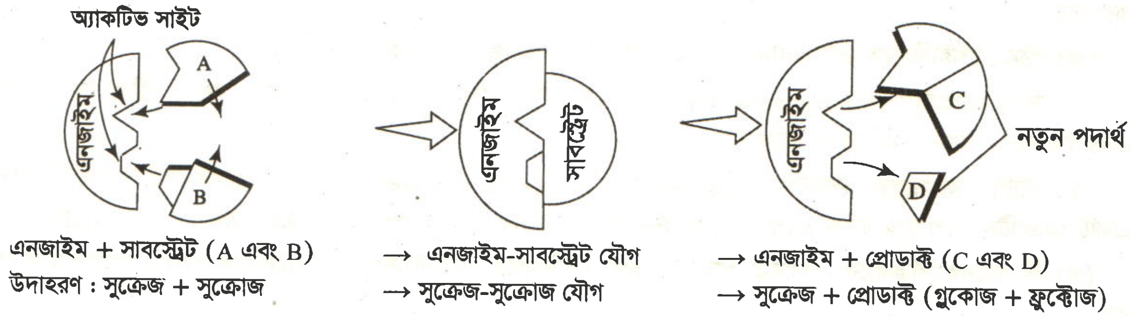

চিত্র ৩.৩ : এনজাইমের ক্রিয়া কৌশল

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট-এ সাবস্ট্রেট সঠিকভাবে 'fit' হয় না। এসব ক্ষেত্রে সাবস্ট্রেট অ্যাকটিভ সাইট-এ সংযুক্ত হলে পুরো এনজাইমের আকার পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এনজাইম সাবস্ট্রেটকে সঠিকভাবে অ্যাকটিভ সাইট-এ `fit' করে নেয়। একে বলা হয় **'induced fit'**। **এ কারণে তালা-চাবি মতবাদ পরিত্যাজ্য বলে মনে করা হয়।** এনজাইমের ক্রিয়া কৌশলে induced fit প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ, তা না হলে বিক্রিয়াটি সূচারুরূপে সম্পন্ন হতো না।

কিছু কিছু পদার্থ এনজাইমের কাজে বাধাদান করে বা বিঘ্ন ঘটায়। এদেরকে **ইনহিবিটর** বলে। **ইনহিবিটর** (inhibitor) এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট-এ আগেই সংযুক্ত হয়ে যায়; ফলে সাবস্ট্রেট ঐ অ্যাকটিভ সাইট-এ আর যুক্ত হতে পারে না। ফলে এনজাইম কাজ করতে পারে না। আবার কতক ইনহিবিটর (বাধাদানকারী) অ্যাকটিভ সাইট ছাড়া অন্য কোনো স্থানে সংযুক্ত হয়ে এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট নষ্ট করে ফেলে, কাজেই সাবস্ট্রেট সেখানে যুক্ত হতে পারে না।

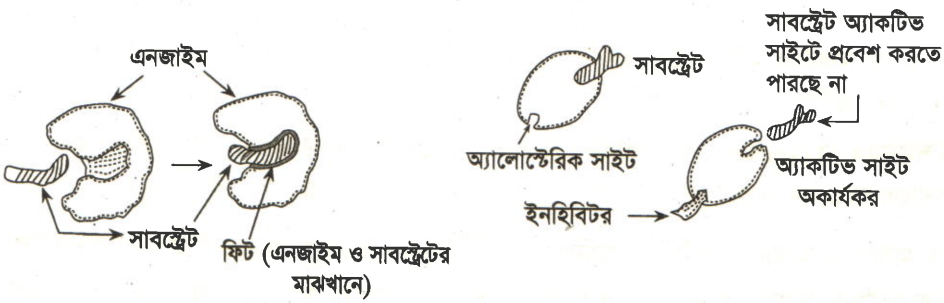

চিত্র ৩.৪ : এনজাইমের কাজের কৌশল : induced fit ও inhibitor

কিছু কিছু এনজাইম আছে যাদের একাধিক সাবইউনিট থাকে। এদের আকৃতি ও কাজ সহজেই পরিবর্তনশীল হতে পারে। এ ধরনের এনজাইমকে বলা হয় **Allosteric enzymes**। অ্যালোস্টেরিক এনজাইমের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে **effector** নামক বিশেষ অণু। ইফেক্টর, এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট ছাড়া অ্যালোস্টেরিক সাইট-এ সংযুক্ত হয়ে অ্যাক্টিভেটর হিসেবে অথবা ইনহিবিটর হিসেবে কাজ করে।

যেকোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করতে কিছুটা অতিরিক্ত শক্তির দরকার হয়। এ অতিরিক্ত শক্তিকে **কার্যকরী শক্তি** বলে। এনজাইম-সাবস্ট্রেট-এর কার্যকরী শক্তি কম। তাই কম কার্যকরী শক্তিসম্পন্ন সাবস্ট্রেট অণু এনজাইমের সাথে যুক্ত হয়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ সৃষ্টি করে, ফলে বিক্রিয়ার হার বেড়ে যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীগণ এনজাইমের কাজের কৌশল বিষয়টি বোর্ডে উপস্থাপন করবে এবং ব্যাখ্যা করবে।

এনজাইমের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Enzymes) : গঠন প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে এনজাইমসমূহকে শ্রেণিবিন্যস্ত করা যায়। আবার কী ধরনের বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তার ওপর ভিত্তি করেও এনজাইমসমূহকে শ্রেণিবিন্যস্ত করা যায়।

(ক) গঠন বৈশিষ্ট্যভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস : গঠন বৈশিষ্ট্যভিত্তিক এনজাইম দু'প্রকার; যথা—

১। সরল এনজাইম (Simple enzymes) : যে এনজাইমের সম্পূর্ণ অংশই শুধু প্রোটিন দিয়ে গঠিত তাকে সরল এনজাইম বলে। যেমন— সুকরেজ, অক্সিডেজ।

২। যৌগিক বা সংযুক্ত এনজাইম (Complex বা conjugated enzymes) : যে এনজাইমের প্রোটিন অংশের সাথে একটি অপ্রোটিন অংশ যুক্ত থাকে তাকে যৌগিক এনজাইম বা কনজুগেটেড এনজাইম বলা হয়। যেমন-FAD, NAD.

(খ) কী ধরনের বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তার ওপর ভিত্তি করে এনজাইমসমূহকে নিম্নলিখিত প্রকারে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

১। অক্সিডোরিডাকটেজ (Oxido-reductases) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের সাথে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন কিংবা ইলেকট্রন সংযুক্ত করে অথবা কোনো পদার্থ থেকে এগুলো বিযুক্ত করে। অক্সিজেন সংযোগ বা হাইড্রোজেন বিয়োজন বা ইলেকট্রন অপসারণকে বলা হয় **অক্সিডেশন** (oxidation) বা **জারণ**। আবার হাইড্রোজেন সংযোগ বা অক্সিজেন বিয়োজন বা ইলেকট্রন যোগ হলো **রিডাকশন** (reduction) বা **বিজারণ**। বাংলায় এদেরকে **জারণ-বিজারণ** (oxidation-reduction) এনজাইম বলা হয়। যেমন— সাইটোক্রোম অক্সিডেজ, ফসফোগ্লিসার‍্যাল্ডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজ ও অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ।

৩-ফসফোগ্লিসার‍্যাল্ডিহাইড + ফসফেট $\xrightleftharpoons{\text{ফসফোগ্লিসার‍্যাল্ডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজ}}$ ১, ৩-বিসফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড

NAD → NADH + H^+

এখানে NAD **বিজারিত** হয়ে (হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে) NADH + H^+ তে পরিণত হয়েছে এবং ৩-ফসফোগ্লিসার‍্যাল্ডিহাইড হাইড্রোজেন হারিয়ে **জারিত** (oxidized) হয়েছে।

২। ট্রান্সফারেজ (Transferase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম কোনো একটি পদার্থ হতে একটি গ্রুপকে (যেমন-NH_2) অপসারিত করে অন্য একটি পদার্থের সাথে সংযুক্ত করতে সহায়তা করে; যেমন—কাইনেজ।

গ্লুটামিক অ্যাসিড + অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড $\xrightarrow{\text{ট্রান্সফারেজ}}$ α-কিটোগ্লুটামিক অ্যাসিড + অ্যাসপারটিক অ্যাসিড

এক্ষেত্রে গ্লুটামিক অ্যাসিড হতে NH_2 গ্রুপ অপসারিত হয়ে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হয়ে তাকে অ্যাসপারটিক অ্যাসিডে পরিণত করেছে এবং নিজে α- কিটোগ্লুটামিক অ্যাসিডে পরিণত হয়েছে।

৩। হাইড্রোলাইটিক এনজাইম বা হাইড্রোলেজ (Hydrolase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের বিশেষ বন্ডের সাথে পানির অণু সংযুক্ত করে তাকে হাইড্রোলাইসিস (আর্দ্র-বিশ্লেষণ) করতে সহায়তা করে; যেমন—সুকরেজ, প্রোটিয়েজ, ফসফাটেজ, এস্টারেজ ইত্যাদি এ জাতীয় এনজাইম।

সুকরোজ + পানি $\xrightarrow{\text{সুকরেজ}}$ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ

৪। লাইয়েজ (Lyase) এনজাইম : এ শ্রেণির এনজাইম হাইড্রোলাইসিস ও জারণ-বিজারণ ছাড়াই অন্য কায়দায় সাবস্ট্রেটের কোনো মূলককে ট্রান্সফার (স্থানান্তর) করে থাকে। এরা কার্বন-কার্বন, কার্বন-অক্সিজেন, কার্বন-নাইট্রোজেন প্রভৃতি যোজকের ওপর কাজ করে; যেমন— অ্যালডোলেজ, আইসোসাইট্রেট লাইয়েজ, ফিউমারেজ, সাইট্রিক সিনথেটেজ ইত্যাদি।

ফ্রুক্টোজ ১, ৬ বিস ফসফেট $\xrightarrow{\text{অ্যালডোলেজ}}$ ৩-ফসফোগ্লিসারেল্ডিহাইড + ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট

৫। **আইসোমারেজ (Isomerase) এনজাইম :** এ জাতীয় এনজাইম অ্যালডোজ (aldose) এবং কিটোজ (ketose) শ্যুগার এর আইসোমেরিক পরিবর্তন সাধন করে; যেমন—ফসফোগ্লুকো-আইসোমারেজ, মিউটেজ।

$$\text{গ্লুকোজ-৬-ফসফেট} \xrightleftharpoons{\text{ফসফোগ্লুকো-আইসোমারেজ}} \text{ফ্রুক্টোজ-৬-ফসফেট}$$

৬। **লাইগেজ (Lygase) এনজাইম :** এ জাতীয় এনজাইম ATP-এর সহায়তায় দুই বা ততোধিক সাবস্ট্রেটকে সংযুক্ত করে নতুন যৌগ সৃষ্টি করে; যেমন—গ্লুটামিক সিনথেটেজ, অ্যাসিটাইল কো-এ সিনথেটেজ, পাইরুভেট কার্বোক্সিলেজ।

$$\text{গ্লুটামিক অ্যাসিড} + NH_3 + ATP \xrightleftharpoons{\text{গ্লুটামিক সিনথেটেজ}} \text{গ্লুটামিন} + ADP + Pi$$

লাইগেজ এনজাইম ব্যবহার করে DNA প্রতিলিপনে ওকাজাকি খণ্ডসমূহ জোড়া লাগানো হয়। DNA লাইগেজ ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ডকে প্লাসমিড DNA-এর সাথে সংযুক্ত করা হয়।

৭। **কার্বোক্সিলেজ (Carboxylase) এনজাইম :** এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের সাথে CO_2 অণু যুক্ত করতে অথবা কোনো পদার্থ হতে CO_2 বিযুক্ত করতে সহায়তা করে; যেমন—কার্বোক্সিলেজ।

$$\text{অক্সালো সাকসিনিক অ্যাসিড} \xrightleftharpoons{\text{কার্বোক্সিলেজ}} \alpha\text{- কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড} + CO_2$$

৮। **এপিমারেজ (Apimerase) এনজাইম :** এ জাতীয় এনজাইমসমূহ কোনো পদার্থকে এর এপিমারে পরিণত করতে সহায়তা করে। এপিমার অণুগুলো কেবলমাত্র একটি কার্বন এটমের কনফিগারেশন দিয়ে পার্থক্যমণ্ডিত।

৯। **ফসফোরাইলেজ (Phosphorylase) এনজাইম :** এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের সাথে ফসফেট গ্রুপ যুক্ত করতে বা কোনো পদার্থ হতে ফসফেট গ্রুপ বিচ্ছিন্ন করতে সহায়তা করে; যেমন—হেক্সোকাইনেজ।

$$\text{গ্লুকোজ} + ATP \xrightarrow{\text{ফসফোরাইলেজ (হেক্সোকাইনেজ)}} \text{গ্লুকোজ-৬-ফসফেট} + ADP$$

(বি.দ্র. IUB অনুসারে এনজাইম প্রথম ৬ প্রকার।) [MAT:11-12]

এনজাইমের কার্যকারিতার প্রভাবকসমূহ

১। **তাপমাত্রা :** 40° সে. এর ওপরে এবং 0° সে. বা তার নিচের তাপমাত্রায় এনজাইমের কার্যকারিতা দারুণভাবে কমে যায়। 35° C – 40° C তাপমাত্রায় এনজাইমের বিক্রিয়ার হার সবচেয়ে বেশি। তাই এ তাপমাত্রাকে **পরম তাপমাত্রা** (optimum temperature) বলা হয়।

২। **pH :** অতিরিক্ত অম্ল বা অতিরিক্ত ক্ষার-এ এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয়। অধিকাংশ এনজাইমের ক্ষেত্রে pH ৬-৯ এর মধ্যে থাকে। এক একটি এনজাইমের এক একটি নির্দিষ্ট অপটিমাম pH থাকে।

এনজাইম	**অপটিমাম pH**
পেপসিন	২.০
ইনভারটেজ	৪.৫
সেলুবায়েজ	৫.
ইউরিয়েজ	৭.০
ট্রিপসিন	৮.০

[DAT: 17-18]

৩। **পানি :** কোষে পরিমিত পানির উপস্থিতিতে এনজাইমের কার্যকারিতা স্বাভাবিক থাকে। শুকনো বীজে পানি না থাকায় এনজাইম নিষ্ক্রিয় থাকে।

৪। **ধাতু :** কোনো কোনো ধাতুর (যেমন– Mg^{++}, Mn^{++}, Co, Ni) উপস্থিতি এনজাইমের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। আবার কোনো কোনো ধাতুর (যেমন- Ag, Zn, Cu) উপস্থিতি এনজাইমের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে।

৫। **সাবস্ট্রেট-এর ঘনত্ব :** সাবস্ট্রেট-এর ঘনত্বের ওপরও এনজাইমের কর্মক্ষমতা নির্ভরশীল। সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব বাড়লে এনজাইমের কর্মক্ষমতা বাড়ে এবং ঘনত্ব কমলে কর্মক্ষমতা কমে।

৬। **এনজাইমের ঘনত্ব :** এনজাইমের ঘনত্বের ওপরও এদের কর্মক্ষমতা নির্ভরশীল।

৭। **প্রোডাক্ট-এর ঘনত্ব :** প্রোডাক্ট-এর পরিমাণ বেড়ে গেলে বিক্রিয়ার হার কমে যেতে পারে।

৮। **অ্যাকটিভেটর :** অ্যাকটিভেটরের উপস্থিতিতে এনজাইমের বিক্রিয়ার হার বাড়ে।

৯। **প্রতিরোধক (ইনহিবিটর) :** এর দ্বারা এনজাইমের কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত হয়।

এনজাইমের কাজ : এনজাইমের প্রধান কাজ হলো জীবদেহের শারীরবৃত্তীয় বিক্রিয়াগুলো পরিচালনা করে জীবদেহকে কর্মক্ষম রাখা। জীবদেহের গঠন ও বৃদ্ধি সবই নিয়ন্ত্রিত হয় এনজাইমের কার্যক্রম দিয়ে। জীবদেহে শক্তি সঞ্চয়ের পেছনেও এনজাইম ক্রিয়াশীল, আবার শক্তি নির্গমনের পেছনেও এনজাইম ক্রিয়াশীল। এটি বিক্রিয়ার গতিকে বাড়ায় আবার বিক্রিয়ার পরে অপরিবর্তিত থাকে। **স্বল্প পরিমাণ এনজাইম প্রচুর পরিমাণ সাবস্ট্রেটকে প্রোডাক্টে পরিণত করে।** বিভিন্ন জটিল যৌগকে সরল যৌগে পরিণত করে। দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য সংশ্লেষ করে।

স্টার্চ (শ্বেতসার) হাইড্রোলাইসিসের জন্য ১০০° সে. তাপমাত্রার প্রয়োজন হলেও এনজাইমের প্রভাবে স্বাভাবিক দৈহিক পরিবেশে অন্ত্রে শ্বেতসারজাতীয় খাদ্যের পরিপাক ঘটে এবং গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। এভাবে আমিষ, চর্বি ও অন্যান্য বড় অণুর জৈবিক বিশ্লেষণ স্বাভাবিক অবস্থায় ঘটে থাকে। তাই অনেকে বলে থাকেন **এনজাইমের সিস্টেমেটিক কার্যক্রমই হলো জীবন।**

জৈবিক কার্যক্রমে এনজাইমের ব্যবহার

১। **সেলুলেজ (Cellulase) :** যে এনজাইম সেলুলোজকে হাইড্রোলাইসিস করে সেলুবায়োজ-উৎপন্ন করে তাকে **সেলুলেজ** বলে। উদ্ভিদদেহের প্রধান গাঠনিক পদার্থ হলো সেলুলোজ। মৃত উদ্ভিদদেহ পচে না গেলে সমস্ত পৃথিবী আজ মৃত উদ্ভিদ দিয়ে ভরা থাকতো। সেলুলেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় এরা ক্রমান্বয়ে পচে মাটির সাথে মিশে যায়। তৃণভোজী প্রাণীদের পৌষ্টিকতন্ত্র থেকে সেলুলেজ এনজাইম ক্ষরণ হয় বলে তারা কাঁচা উদ্ভিদ পরিপাক করতে পারে। মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্র থেকে সেলুলেজ এনজাইম ক্ষরণ হয় না।

$$\text{সেলুলোজ} \xrightarrow{\text{সেলুলেজ}} \text{সেলুবায়োজ} \xrightarrow{\text{সেলুবায়েজ}} \text{গ্লুকোজ}$$

সেলুলেজের ব্যবহার :

* কফি প্রক্রিয়াজাতকরণে সেলুলেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।
* পেপার এন্ড পাল্প এবং বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত হয়।
* ওয়াশিং পাউডার ও লন্ড্রি ডিটারজেন্টের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
* ফলের জুস ও বিভিন্ন ধরনের পানীয় উৎপাদনে সেলুলেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।
* ওষুধ শিল্পেও এর যথেষ্ট প্রয়োগ রয়েছে।

২। **প্রোটিয়েজ (Protease) :** যে এনজাইম প্রোটিনকে ভেঙে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে তাকে **প্রোটিয়েজ** বলে। বীজের সঞ্চিত প্রোটিন বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় প্রোটিয়েজ এনজাইমের কার্যকারিতায় ভেঙে যায় এবং তা দ্রুত ভ্রূণে স্থানান্তরিত হয়ে প্রয়োজনানুযায়ী নতুন প্রোটিন তৈরি করে। আমরা যে প্রোটিন জাতীয় খাবার খাই তাও প্রোটিয়েজ এনজাইমের কার্যকারিতায় হজম হয়; ফলে আমাদের দেহ গঠিত হয়। প্রোটিয়েজভুক্ত এনজাইমগুলো হচ্ছে- **পেপসিন, ট্রিপসিন ও প্যাপেইন।**

প্রোটিয়েজের ব্যবহার :

* বিভিন্ন শিল্প, ওষুধ তৈরি এবং জীববিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় প্রোটিয়েজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।
* বেকারি শিল্পে এ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।
* রক্ত তঞ্চন নিয়ন্ত্রণে প্রোটিয়েজ নামক এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৩। **অ্যামাইলেজ (Amylase) :** স্টার্চ-এর প্রধান উপাদান হলো অ্যামাইলোজ। কোনো কোনো স্টার্চ-এর সবটুকুই অ্যামাইলোজ দিয়ে তৈরি। গ্লুকোজ একক সোজা চেইন-এর পলিমার সৃষ্টি করে স্টার্চ গঠন করে। যে এনজাইম অ্যামাইলোজের ওপর কার্যকর ভূমিকা পালন করে তাকে **অ্যামাইলেজ** বলে। অ্যামাইলেজ দু'ধরনের : যথা– আলফা অ্যামাইলেজ ও বিটা অ্যামাইলেজ। α-অ্যামাইলেজ সাবস্ট্রেটকে ভেঙে প্রথমে ডেক্সট্রিনে পরিণত করে। β-অ্যামাইলেজ পরে ডেক্সট্রিনকে ভেঙে মল্টোজে পরিণত করে।

অ্যামাইলেজের ব্যবহার :

* স্টার্চ থেকে বিয়ার ও মদ উৎপাদন শিল্পে অ্যামাইলেজ ব্যবহার হয়।
* কাপড় ও বাসনকোসন থেকে স্টার্চ অপসারণের জন্য ডিটারজেন্টে অ্যামাইলেজ ব্যবহার করা হয়।
* জটিল স্টার্চকে সরল চিনিতে পরিণত করতে পাউরুটি শিল্পে অ্যামাইলেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।
* প্যানক্রিয়েটিক এনজাইম রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি (replacement therapy) চিকিৎসায় এ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৪। **ক্যাটালেজ (Catalase) :** যে এনজাইম হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডকে ভেঙ্গে পানি এবং অক্সিজেনে পরিণত করে তাকে **ক্যাটালেজ** বলে। প্রায় প্রতিটি জীবকোষেই ক্যাটালেজ এনজাইম পাওয়া যায়। এরা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (H_2O_2) কে ভেঙে পানি (H_2O) এবং অক্সিজেন (O_2) উৎপন্ন করে। এক অণু ক্যাটালেজ এনজাইম অল্প সময়ে লক্ষ লক্ষ H_2O_2 অণুকে বিজারিত করে (ভেঙে) পানি ও অক্সিজেন-এ রূপান্তরিত করতে পারে।

$$2H_2O_2 \xrightarrow{\text{ক্যাটালেজ}} 2H_2O + O_2$$

ক্যাটালেজের ব্যবহার :

* পনির তৈরির পূর্বে দুধ থেকে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড অপসারণে দুগ্ধ শিল্পে ক্যাটালেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।
* কাপড় থেকে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড অপসারণ করার জন্য বস্ত্রশিল্পে ক্যাটালেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।
* চোখের কন্টাক্ট লেন্স (Contact lens) পরিষ্কারের কাজে এ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৫। **জাইমেজ (Zymase) :** কতক ছত্রাক, বিশেষ করে **ঈস্ট** (yeast) জাতীয় ছত্রাক কোষে জাইমেজ এনজাইম বিদ্যমান। জাইমেজ এনজাইম একটু জটিল প্রকৃতির। ঈস্টজাতীয় ছত্রাকে বিদ্যমান যে এনজাইম শর্করাকে ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় ইথাইল অ্যালকোহল ও CO_2-এ পরিণত করে তাকে **জাইমেজ** বলে। অ্যালকোহল উৎপাদন ও বেকারি শিল্পে জাইমেজ এনজাইম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} \xrightarrow{\text{জাইমেজ}} \underset{\text{ইথাইল অ্যালকোহল}}{2C_2H_5{-}OH} + 2CO_2$$

জাইমেজের ব্যবহার :

* ঈস্ট থেকে জাইমেজ এনজাইম সংগ্রহ করে বদহজম হওয়া রোগীদের ওষুধ হিসেবে দেয়া হয়।
* অ্যালকোহল উৎপাদনে জাইমেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৬। **লাইপেজ (Lipase) :** যেসব এনজাইম লাইপোলাইসিস বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে লিপিডকে আর্দ্র-বিশ্লেষণ করে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে তাকে **লাইপেজ** বলে। অধিকাংশ প্রাণিদেহে লাইপেজ এনজাইম লিপিড খাদ্যের পরিপাক, পরিবহণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রধান ভূমিকা রাখে।

লাইপেজের ব্যবহার :

* দই ও পনির শিল্পে লাইপেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়। DAT: 22-23
* বেকারি শিল্পে, ডিটারজেন্ট শিল্পে ও জৈব অনুঘটক হিসেবে এ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।
* অগ্ন্যাশয়ের বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে রক্তের লাইপেজ পরীক্ষা করা হয়।

ব্যবহারিক জীবনে এনজাইমের প্রয়োগ/গুরুত্ব : আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এনজাইমের ব্যবহার বহুবিধ। নিম্নে এনজাইমের এ বহুমুখী ব্যবহার উল্লেখ করা হলো।

RMDAC

১। **ফলের রস তৈরি (Preparing fruit juice) :** আম, কমলালেবু, আপেল, আঙ্গুর প্রভৃতি ফলের রস তৈরিতে এনজাইম ব্যবহার করা হয়। এসব ফলের রস তৈরিকালে **পেকটিন** নামক এনজাইম ব্যবহার করলে রসের ঘোলাটে অবস্থা কেটে যায় এবং রস পরিষ্কার ও স্বাদযুক্ত হয়।

২। **পনির তৈরি (Making cheese) :** দুধ থেকে পনির তৈরিতে রেনিন এনজাইম ব্যবহৃত হয়। রেনিন এনজাইম দুধের ননীকে জমাট বাঁধতে সহায়তা করে এবং পরে ননী থেকে পনির তৈরি করা হয়।

৩। **কাপড়ে দাগ মোচন (Destaining of fabrics) :** কাপড়ের দাগ ওঠাতে অ্যামাইলেজ ও লাইপেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়। এতে দাগ একেবারে ওঠে যায় কিন্তু কাপড়ের কোনো ক্ষতি হয় না।

৪। **চামড়া লোমমুক্তকরণ (Dehairing of hide) :** ট্যানারিতে লেদার তৈরি করার সময় কাঁচা চামড়া থেকে লোম আলাদা করতে প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৫। **ক্ষত নিরাময় (Wound healing) :** চামড়ায় সৃষ্ট পোড়া ক্ষত নিরাময়ে এক ধরনের এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৬। **হজম সংশোধন (Correcting digestion) :** শরীরে এনজাইমের পরিমাণ কমে গেলে হজমে সমস্যা দেখা যায়। এনজাইমের এ ঘাটতি পূরণ হলে হজমে অনিয়ম দূরীভূত হয়। পেপসিন, অ্যামাইলেজ, পেপেইন ইত্যাদি এনজাইম হজমে সাহায্য করে।

৭। **প্রাণ-রাসায়নিক বিশ্লেষণ (Analyzing biochemicals) :** বর্তমানে ক্লিনিক্যাল বিশ্লেষণে এনজাইম ব্যবহার করা হয়। রক্তে ইউরিয়া ও ইউরিক অ্যাসিড শনাক্তকরণে ইউরিয়েজ ও ইউরিকেজ নামক এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৮। **চোখের ছানির অস্ত্রোপচার (Cataract surgery) :** আমেরিকার চক্ষু চিকিৎসক **ড. যোসেফ স্পিনা** ১৯৮০ সালে এনজাইম ট্রিপসিন প্রয়োগ করে চোখের ছানির অস্ত্রোপচার করেন। ড. যোসেফ স্পিনার অস্ত্রোপচার পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম সুঁচ দ্বারা ০.০২৫ সেমি প্রশস্ত ছিদ্র করে অন্য একটি সূক্ষ্ম ফাঁপা সুঁচের সাহায্যে অতি সামান্য পরিমাণ ট্রিপসিন চোখের লেন্সে প্রয়োগ করেন। ট্রিপসিন চোখের অন্যান্য অংশের কোনো ক্ষতি না করে লেন্সের খোলা অংশ গলিয়ে ফেলে। এরপর এ সুঁচ দিয়ে টেনে খোলা অংশ বের করে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা হয়।

৯। **চিকিৎসায় এনজাইমের ব্যবহার :** ডায়াবেটিস রোগীর রক্তে শর্করার পরিমাণ কত তা নির্ণয়ের জন্য গ্লুকোজ অক্সিডেজ ও পারঅক্সিডেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ব্যবহার করে চিকিৎসকগণ অনেকাংশে মৃত্যু ঝুঁকি কমাতে সক্ষম হয়েছেন।

১০। **আইসক্রিম ও ক্যান্ডি তৈরিতে :** ল্যাকটেজ এনজাইম ব্যবহার করে নরম, মোলায়েম আইসক্রিম এবং ইনভার্টেজ এনজাইম ব্যবহার করে ক্যান্ডি তৈরি করা হয়।

১১। **জমাট রক্ত গলানো (Dissolving blood clod) :** মস্তিষ্ক ও ধমনীর জমাট রক্ত গলাতে ইউরোবাইলেজ নামক এনজাইমের ব্যবহারে জাপানে সফলতা পেয়েছে।

১২। **ফটোগ্রাফি শিল্পে (Photographic industry) :** ফটোফিল্মের জেলাটিন পরিষ্কার করতে প্রোটিয়েজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

১৩। **কাগজ শিল্পে (Paper industry) :** কাগজ বর্ণহীন করার সময় ব্যবহৃত ব্লিচিং (bleach) এর পরিমাণ কমাতে **জাইলানেজ**, কাগজে মসৃণতা আনতে এবং পানির পরিমাণ কমাতে **সেলুলেজ** এবং লিগনিন অপসারণ করে কাগজকে মসৃণ করতে **লিগনিনেজ** এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

১৪। **রাবার শিল্পে (Rubber industry) :** ল্যাটেক্স থেকে রাবার তৈরি করার সময় হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড থেকে অক্সিজেন তৈরি করতে **ক্যাটালেজ** এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

১৫। **পরিবেশ সংরক্ষণে :** পরিবেশে বিভিন্ন বিদূষক পদার্থের পরিমাণ নির্ধারণে উৎসেচক ব্যবহার করে বায়োসেন্সর তৈরি করা হয়।

১৬। **জীবপ্রযুক্তিতে :** জিন প্রকৌশলে বিভিন্ন ধরনের উৎসেচক ব্যবহার করে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি, RNA ও DNA এর ক্ষার বিন্যাস নির্ণয় এবং নিউক্লিওটাইডের যোজন বা বিয়োজন করা হয়। রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সহায়তায় DNA অংশের কর্তন, লাইগেজ এনজাইমের সহায়তায় জোড়া লাগানো ও পলিমারেজ এনজাইমের সহায়তায় DNA এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়।

১৭। ডিটারজেন্ট বা পরিষ্কারক প্রস্তুতিতে : ডিটারজেন্ট বা পরিষ্কারক পদার্থ তৈরিতে সেরিন প্রোটিয়েজ, α-অ্যামাইলেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

Reading

এনজাইম ও কো-এনজাইমের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	এনজাইম	কো-এনজাইম
১। প্রকৃতি	এনজাইম একটি বড়ো প্রোটিন অণু।	কো-এনজাইম প্রোটিন অণুর একটি অপ্রোটিন অংশ (জৈব রাসায়নিক যৌগ)।
২। আণবিক ওজন	এনজাইমের আণবিক ওজন ১২০০০ – ১০,০০,০০০ ডাল্টন।	কো-এনজাইম অংশের আণবিক ওজন অনেক কম (৫০০ ডাল্টন-এর কাছাকাছি)।
৩। কাজ	এনজাইম স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে।	কো-এনজাইম স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ প্রোটিন অংশ ব্যতীত কাজ করতে পারে না।
৪। তাপের প্রভাব	50°C – 60°C তাপমাত্রায় এনজাইমের কার্যকারিতা থাকে না। অর্থাৎ তাপে নষ্ট হয়।	কো-এনজাইমের তাপমাত্রা সহন ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই ঐ তাপমাত্রায় কো-এনজাইম অকেজো হয় না। [DAT: 23-24]
৫। ভিটামিন	কোনো ভিটামিন এনজাইম হিসেবে কাজ করে না।	অনেক ভিটামিন কো-এনজাইম হিসেবে কাজ করে।
৬। উদাহরণ	প্রোটিয়েজ, লাইপেজ ইত্যাদি।	ATP, NAD, FAD ইত্যাদি।

Reading

অজৈব অনুঘটক এবং উৎসেচক-এর মধ্যে পার্থক্য

অজৈব অনুঘটক	উৎসেচক
১. জীবকোষে উৎপন্ন হয় না।	২. জীবকোষে উৎপন্ন হয়।
২. অজৈব অনুঘটকের ক্রিয়ার জন্য কো-ফ্যাক্টর বা কো-এনজাইমের প্রয়োজন হয় না।	২. কো-ফ্যাক্টর বা কো-এনজাইমের প্রয়োজন হয়।
৩. আণবিক ভর অপেক্ষাকৃত কম।	৩. আণবিক ভর অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি।
৪. বেশি তাপ প্রয়োগে বিনষ্ট হয় না।	৪. বেশি তাপ প্রয়োগে বিনষ্ট হয়।
৫. অজৈব অনুঘটকের কাজে pH এর তেমন কোনো ভূমিকা নেই।	৫. নির্দিষ্ট pH উৎসেচকের সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা প্রকাশ করে।

সার-সংক্ষেপ

কার্বোহাইড্রেট : কার্বোহাইড্রেট হলো জীবদেহের উল্লেখযোগ্য জৈব রাসায়নিক পদার্থ। কার্বন-হাইড্রোজেন-অক্সিজেন সহযোগে কার্বোহাইড্রেট গঠিত হয়। কার্বোহাইড্রেটকে বাংলায় শর্করা বলা হয়। জীবদেহে শক্তির প্রধান উৎস হলো কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট মিষ্টি স্বাদবিশিষ্ট, যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ (চিনি), আবার কতক কার্বোহাইড্রেট মিষ্টি নয়, যেমন- স্টার্চ, সেলুলোজ। কার্বোহাইড্রেটকে মনোস্যাকারাইড, ডাইস্যাকারাইড, অলিগোস্যাকারাইড এবং পলিস্যাকারাইড হিসেবে ভাগ করা যায়। DNA, RNA গঠনকারী পেন্টোজ শ্যুগারও কার্বোহাইড্রেট। কোষপ্রাচীর গঠনকারী সেলুলোজও কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট আমাদের প্রধান খাদ্য উপাদান। চাল, গম, আলু এসবই কার্বোহাইড্রেট-এর প্রধান উৎস।

অ্যামিনো অ্যাসিড : প্রোটিন (আমিষ) গঠনকারী একক হলো অ্যামিনো অ্যাসিড। অ্যামিনো অ্যাসিডে, অ্যামিনো গ্রুপ $-NH_2$ এবং কার্বোক্সিল গ্রুপ -COOH অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। প্রধানত বিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্ন অনুক্রমে সজ্জিত হয়ে জীবদেহের সকল প্রোটিন (সকল এনজাইমসহ) গঠন করে থাকে। এ প্রোটিনের মাধ্যমেই জিন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য জীবদেহে প্রকাশিত ও স্থানান্তরিত হয়।

প্রোটিন : প্রোটিনের বাংলা করা হয়েছে আমিষ। আমাদের খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডাল রাখা হয়েছে প্রোটিনের উৎস হিসেবে, কারণ জীবদেহে প্রোটিনের উপস্থিতি অপরিহার্য। জীবদেহের DNA গঠনেও প্রোটিন প্রয়োজনীয়, সকল

এনজাইমই প্রোটিন। এনজাইম না থাকলে জীবকোষের সকল ক্রিয়া-বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে, প্রোটিন না থাকলে জিনের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবে।

সুকরোজ : চিনি হলো সুকরোজ-এর উদাহরণ। এটি একটি ডাইস্যাকারাইড কার্বোহাইড্রেট। উদ্ভিদদেহের প্রধান ডাইস্যাকারাইড হলো সুকরোজ। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ মিলিতভাবে গঠন করে সুকরোজ। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ রিডিউসিং শ্যুগার হলেও সুকরোজ রিডিউসিং শ্যুগার নয়। পাতায় প্রস্তুত কার্বোহাইড্রেট সুকরোজ হিসেবে বিভিন্ন অঙ্গে প্রবাহিত হয়। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$.

এনজাইম : এনজাইম হলো জৈব-অনুঘটক যা জীবদেহে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়ার পর নিজেরা অপরিবর্তিত থাকে। সকল এনজাইমই প্রোটিন। সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট এনজাইম জীবদেহে কোনো নির্দিষ্ট বিক্রিয়া বা বিক্রিয়া গ্রুপকে প্রভাবিত করে। একটি নির্দিষ্ট এনজাইমের অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা ও অনুক্রম সুনির্দিষ্ট। সাবস্ট্রেট-এর ধরন অনুসারে বা বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে বা সাবস্ট্রেট-বিক্রিয়ার মিলিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে এনজাইমের নামকরণ করা হয়। এনজাইমের শ্রেণিবিন্যাস করা হয় গঠন বৈশিষ্ট্য অথবা বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে। এনজাইমের কার্যকারিতা তাপমাত্রা, pH ইত্যাদি পরিবেশীয় প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এই অধ্যায়ে দক্ষতা অর্জন

১। যে বস্তুকে রাসায়নিকভাবে ভেঙ্গে আর কোনো সরল বস্তু পাওয়া যায় না তা হলো **রাসায়নিক মৌল**। সকল বস্তু রাসায়নিক মৌল দ্বারা গঠিত।

২। রাসায়নিক মৌল তথা element-এর ক্ষুদ্রতম অংশ যা তার বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে পারে তা হলো **পরমাণু** বা **এটম** (atom)।

৩। বস্তুজগতের গঠন একক হলো **এটম** বা **পরমাণু**। এটমের কেন্দ্রস্থলে **প্রোটন** (+) এবং **নিউট্রন** (০) এক সাথে থাকে। কেন্দ্রের বাইরে (নিউক্লিয়াসের বাইরে) নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট **ইলেকট্রন** থাকে।

৪। এলিমেন্ট বা মৌলের প্রোটন হলো পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট এবং ইলেকট্রন হলো নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট।

৫। **যৌগ বা কম্পাউন্ড :** দুই বা তার অধিক মৌল সুনির্দিষ্ট অনুপাতে সংযুক্ত হয়ে একটি যৌগ বা কম্পাউন্ড গঠন করে। যেমন- পানি (H_2O); দুই অণু হাইড্রোজেন এবং এক অণু অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত।

৬। দু'টি এটমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বন্ড হলো আয়নিক বন্ড। যে এটম ইলেকট্রন হারায় তা পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট হয়। যে এটম ইলেকট্রন গ্রহণ করে তা নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট হয়।

৭। এটমের চার্জ (+/–) অবস্থাকে **আয়ন** বলে। উদ্ভিদ আয়ন হিসেবে খনিজ লবণ শোষণ করে থাকে।

৮। দু'টি অণুর মধ্যকার আকর্ষণজনিত আন্তঃঅণু বন্ড হলো হাইড্রোজেন বন্ড।

৯। কার্বন পরমাণুর কাঠামোবিশিষ্ট অণু হলো **জৈব অণু**।

১০। জৈব অণুর ক্রিয়াশীল (reactive) গ্রুপকে বলা হয় ফাংশনাল গ্রুপ।

১১। জীবদেহের প্রধান প্রধান জৈব অণু হলো কর্বোহাইড্রেট (শর্করা), প্রোটিন (আমিষ), লিপিড (চার্জিত তেল) এবং নিউক্লিক অ্যাসিড।

১২। স্বাদ অনুযায়ী কার্বোহাইড্রেট দু'প্রকার। যথা– শ্যুগার-এরা স্বাদে মিষ্টি, দানাদার এবং পানিতে দ্রবণীয়। যেমন- গ্লুকোজ, সুকরোজ। (ii) **নন্ শ্যুগার**-এরা স্বাদবিহীন, অদানাদার এবং পানিতে অদ্রবণীয়। যেমন- স্টার্চ, সেলুলোজ।

১৩। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ হলো **রিডিউসিং শ্যুগার**। কিন্তু গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ মিলিতভাবে গঠন করে **সুকরোজ** যা রিডিউসিং শ্যুগার নয়।

১৪। সবুজ পাতায় উৎপাদনকৃত কার্বোহাইড্রেট সুকরোজ হিসেবে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে প্রবাহিত হয়।

১৫। অনেকগুলো মনোস্যাকাইড একত্রে পলিমারভুক্ত হয়ে গঠন করে পলিস্যাকারাইড।

১৬। আলু, গম, ধান, ভুট্টা, যব ইত্যাদির শ্বেতসার-এ (স্টার্চ) শতকরা ২২ ভাগ **অ্যামাইলোজ** থাকে এবং শতকরা ৭৮ ভাগ **অ্যামাইলোপেকটিন** থাকে।

১৭। সেলুলোজ উদ্ভিদদেহের প্রধান গাঠনিক উপাদান, তাই সেলুলোজ হলো গাঠনিক পলিস্যাকারাইড।

১৮। অ্যামাইলোজ এর অণু শৃঙ্খল অশাখ কিন্তু অ্যামাইলোপেকটিনের অণু শৃঙ্খল শাখান্বিত।

১৯। গ্লাইকোজেন হলো একটি পুষ্টিজাত পলিস্যাকারাইড, প্রাণিদেহের প্রধান সঞ্চিত খাদ্য, তাই একে প্রাণিজ স্টার্চও বলা হয়।

২০। অ্যামিনো অ্যাসিড হলো জৈব অণু যা প্রোটিনের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। কোনো জৈব অ্যাসিডের এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু অ্যামিনো ($-NH_2$) গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপনের ফলে যে অ্যাসিড উৎপন্ন হয় তাকে আমিনো অ্যাসিড বলা হয়।

২১। প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিডে কমপক্ষে একটি অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) এবং একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ ($-COOH$) থাকে।

২২। প্রোটিন গঠনকারী অ্যামিনো অ্যাসিড ২০টি।

২৩। অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড ৮টি (শিশুদের জন্য ১০টি)।

২৪। অসংখ্য অ্যামিনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত বৃহদাণুর জৈব রাসায়নিক পদার্থ হলো প্রোটিন বা আমিষ।

২৫। জীবদেহের শুষ্ক ওজনের প্রায় ৫০ ভাগই প্রোটিন।

২৬। সব এনজাইমই প্রোটিন, তবে সব প্রোটিনই এনজাইম নয়।

২৭। কোনো জীবকোষ, জীবটিস্যু বা জীব কর্তৃক উৎপাদিত সকল প্রোটিনের সমষ্টিকে বলা হয় **প্রোটিওম**।

২৮। আদর্শ প্রোটিন আছে ডিম ও দুধ-এ, তাই ডিম ও দুধ হলো আদর্শ খাবার।

২৯। মানবদেহের জন্য উদ্ভিজ্জ প্রোটিন থেকে প্রাণিজ প্রোটিন অধিক উপযোগী।

৩০। গ্লিসারোল ও ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টারকে লিপিড বলা হয়। তেল এবং চর্বি লিপিডের উদাহরণ।

৩১। লিনোলিক (linoleic) এবং লিনোলেনিক (linolenic) কে বলা হয় অত্যাবশ্যকীয় (essential) ফ্যাটি অ্যাসিড।

৩২। ফ্যাটি অ্যাসিডের ডবল বন্ড-এর একই দিকে দুটি হাইড্রোজেন অবস্থিত থাকলে $\left(\begin{array}{c} \mathrm{H}\quad\mathrm{H} \\ |\qquad| \\ -\mathrm{C}=\mathrm{C}- \end{array}\right)$ তাকে বলা হয় **সিজ ফ্যাটি অ্যাসিড**। ডবল বন্ড-এর দুই দিকে দুটি হাইড্রোজেন $\left(\begin{array}{c} \qquad\mathrm{H} \\ \qquad| \\ -\mathrm{C}=\mathrm{C}- \\ |\qquad \\ \mathrm{H}\qquad \end{array}\right)$ থাকলে তাকে বলা হয় **ট্রান্সফ্যাটি অ্যাসিড**।

৩৩। ফ্যাটি অ্যাসিডের মাথার CH_3-এর পর ৩নং কার্বনে ডবল বন্ড থাকলে তাকে বলা হয় **ওমেগা-৩** এবং ৬নং কার্বনে ডবল বন্ড থাকলে তাকে বলা হয় **ওমেগা-৬** ফ্যাটি অ্যাসিড।

৩৪। চারটি কার্বন রিং-এর শির দাঁড়ার ওপর কার্বনে পার্শ্বশিকল নিয়ে গঠিত লিপিড হলো **স্টেরয়েড**, কোলেস্টেরল একটি স্টেরয়েড।

৩৫। জীবদেহে যে প্রোটিন (জৈব রাসায়নিক পদার্থ) অল্পমাত্রায় বিদ্যমান থেকে বিভিন্ন বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়া শেষে নিজেরা অপরিবর্তিত থাকে সেই প্রোটিনই **এনজাইম**।

৩৬। ঈস্ট কোষ থেকে **জাইমেজ** এনজাইম আবিষ্কৃত হয় ১৮৯৭ সালে।

৩৭। কোষ থেকে **ইউরিয়েজ** এনজাইম পৃথক করা হয় ১৯২৬ সালে; পৃথক করেন জ্যাম্‌স সামনার।

৩৮। কোনো কোনো এনজাইমে প্রোটিন অংশের সাথে একটি অপ্রোটিন অংশ সংযুক্ত থাকে। সংযুক্ত সেই অপ্রোটিন অংশকে **প্রোসথেটিক গ্রুপ** বলে। প্রোসথেটিক গ্রুপটি কোনো মেটাল হলে সেই মেটাল অংশকে বলা হয় **কোফ্যাক্টর**।

৩৯। প্রোটিন এবং অপ্রোটিন অংশের সমন্বয়ে গঠিত এনজাইমের প্রোটিন অংশকে বলা হয় **অ্যাপোএনজাইম**।

৪০। এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপ কোনো জৈব রাসায়নিক পদার্থ হলে তাকে **কো-এনজাইম** বলা হয়।

৪১। চোখের ছানি অপারেশনে **ট্রিপসিন** এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৪২। **রেস্ট্রিকশন** এনজাইম দিয়ে DNA অণুর অংশ কাটা হয়, আবার **লাইগেজ** এনজাইম দিয়ে কাটা DNA খণ্ড জোড়া লাগানো হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। নিচের কোনটি রিডিউসিং শ্যুগার ?

(ক) গ্লুকোজ (খ) স্টার্চ (গ) সেলুলোজ (ঘ) গ্লাইকোজেন

২। লিপিডের বৈশিষ্ট্য হলো—

(i) পানির চেয়ে হালকা

(ii) হাড়ের সন্ধিস্থলে লুব্রিকেন্ট হিসেবে কাজ করে

(iii) ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল দ্বারা গঠিত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নাসিমার চোখে ছানি পড়েছে, তাই ঝাপসা দেখছে। ডাক্তার ছানি অপারেশনে এক প্রকার জৈব পদার্থ ব্যবহার করলেন যা চোখের ছানিকে গলিয়ে দিল। উক্ত জৈব পদার্থের একটি অংশ আবার জীবদেহের প্রতিরক্ষী হিসেবেও কাজ করে।

৩। ছানি অপারেশনে যে জৈব পদার্থ ব্যবহার করলো তার বৈশিষ্ট্য হলো—

(i) রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়া শেষে অপরিবর্তিত থাকে

(ii) এর কার্যকারিতা সুনির্দিষ্ট

(iii) এরা বিক্রিয়ার হার ও বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থার পরিবর্তন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। উদ্দীপকের জৈব পদার্থের যে অংশ প্রতিরক্ষী হিসেবে কাজ করে তার নাম কী ?

(ক) কার্বোহাইড্রেট (খ) লিপিড (গ) প্রোটিন (ঘ) নিউক্লিক অ্যাসিড

বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলির উত্তরমালা :

১। (ক)	২। (খ)	৩। (ক)	৪। (গ)

সৃজনশীল প্রশ্নের (CQ) নমুনা

১। উদ্দীপকটি পড়ো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

রহিম সকালের নাস্তা আলুভাজি ও রুটি খেয়ে টিস্যুপেপার দিয়ে হাত মুছে কলেজে এলো।

(ক) কোন লিপিড রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে ?

(খ) দুটি কো-এনজাইমের পূর্ণ নাম লেখ।

(গ) রহিমের নাস্তায় কী ধরনের জৈববস্তু আছে তার নাম ও গাঠনিক সংকেত লেখ।

(ঘ) যে জৈববস্তু দ্বারা টিস্যুপেপার তৈরি তার সাথে রহিমের নাস্তার কী সম্পর্ক আছে যুক্তি দ্বারা বোঝাও।

২। জীববিজ্ঞান শিক্ষক ক্লাসে একদিন দুটি পলিস্যাকারাইড (পলি অণু) সম্পর্কে ধারণা দিলেন যার একটি উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে বিরাজ করে অন্যটি উচ্চশ্রেণির প্রাণিদেহে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে থাকে।

(ক) লিপিড কী?

(খ) Peptide Bond বলতে কী বুঝ?

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত প্রথম পলি অণুটির গঠন বর্ণনা করো।

(ঘ) উদ্দীপকে আলোচিত খাদ্য দুটির মধ্যে তুলনা করো এবং মন্তব্য করো। কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা

BRYOPHYTA AND PTERIDOPHYTA

প্রধান শব্দসমূহ : মস, ফার্ন, প্রোথ্যালাস

আমরা সারাবছরই কোনো না কোনো গাছে ফুল ফুটতে দেখি। গ্রীষ্মে স্বর্ণচাপা, সোনালু, বর্ষায় কদম, শরৎ-হেমন্তে শেফালি, শীতে গোলাপ, সূর্যমুখী, ডালিয়া, বসন্তে পলাশ, শিমুল ইত্যাদি। এসব উদ্ভিদ হলো **পুষ্পক উদ্ভিদ** (flowering plants). এদেরকে **ফ্যানেরোগ্যামস** (phanerogams)ও বলা হয়। আবার অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের কখনোই ফুল হয় না। এসব উদ্ভিদকে বলা হয় **অপুষ্পক উদ্ভিদ** (non-flowering plants). এরা **ক্রিপ্টোগ্যামস** (cryptogams) নামেও পরিচিত। ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা গ্রুপের উদ্ভিদসমূহ হলো অপুষ্পক উদ্ভিদ। পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত শৈবাল এবং ছত্রাকও অপুষ্পক উদ্ভিদ। শৈবাল ও ছত্রাক হলো লোয়ার ক্রিপ্টোগ্যামস (lower cryptogams) এবং ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা গ্রুপের উদ্ভিদ হলো হায়ার ক্রিপ্টোগ্যামস (higher cryptogams), কারণ এরা গঠনগত বৈশিষ্ট্যে শৈবাল ও ছত্রাক অপেক্ষা উন্নত ও জটিল প্রকৃতির। এ দু'টোর মধ্যে আবার টেরিডোফাইটা উন্নত। ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটার মধ্যে বাহ্যিক মৌলিক পার্থক্য হলো ব্রায়োফাইটা উদ্ভিদসমূহকে সত্যিকার মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না কিন্তু টেরিডোফাইটা উদ্ভিদসমূহকে সত্যিকার মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা চলে। এছাড়া ব্রায়োফাইটা অভাস্কুলার কিন্তু টেরিডোফাইটা ভাস্কুলার। অপেক্ষাকৃত কম উন্নত থ্যালোফাইটা (শৈবাল ও ছত্রাক) এবং উন্নত টেরিডোফাইটার মধ্যে **সংযোগ সৃষ্টিকারী মধ্যবর্তী গ্রুপ** হলো ব্রায়োফাইটা।

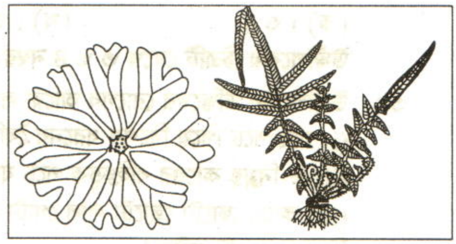

উপরে পাশাপাশি দু'টি উদ্ভিদের চিত্র দেয়া হলো, একটি ব্রায়োফাইটা উদ্ভিদ, অপরটি টেরিডোফাইটা উদ্ভিদ। কোনটি ব্রায়োফাইটা আর কোনটি টেরিডোফাইটা চিনতে পার কি? চিনতে পারলে চিত্রের নিচে নাম লেখ।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে–	পাঠ পরিকল্পনা	
❖ ব্রায়োফাইটার বৈশিষ্ট্য।	পাঠ ১	ব্রায়োফাইটা
❖ *Riccia* এর আবাস, গঠন ও শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য।	পাঠ ২	*Riccia* এর বৈশিষ্ট্য, গঠন
	পাঠ ৩	*Riccia* এর জনন
❖ টেরিডোফাইটার বৈশিষ্ট্য।	পাঠ ৪	টেরিডোফাইটা
❖ *Pteris* এর আবাস, গঠন, জনুঃক্রম।	পাঠ ৫	*Pteris* এর স্পোরোফাইটের গঠন
ব্যবহারিক :	পাঠ ৬	*Pteris* এর গ্যামিটোফাইটিক পর্যায়
০ *Pteris* এর স্পোরোফাইট শনাক্তকরণ।	পাঠ ৭	*Pteris* এর জীবনচক্র ও জনুঃক্রম
	পাঠ ৮	**ব্যবহারিক :** *Pteris* এর স্পোরোফাইট পর্যবেক্ষণ

৬.১ : ব্রায়োফাইটা (Bryophyta) বা মসবর্গীয় উদ্ভিদ

(Gk. *Bryon* = মস এবং *phyton* = উদ্ভিদ)

প্রচলিত শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী ব্রায়োফাইটা একটি বিভাগ। Margulis এর শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী ব্রায়োফাইটা একটি গ্রেড এবং ফাইলাম (বিভাগ)। Wallace, Sanders ও Ferl-এর Biology (১৯৯৬) অনুযায়ী ব্রায়োফাইট্স-এর প্রজাতির সংখ্যা ১৫,৬০০ যার অধিকাংশই স্থলজ, কিছু জলজ। স্থলজ প্রজাতিগুলোরও জীবনচক্র, বিশেষ করে নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করতে পানির প্রয়োজন হয়। তাই ব্রায়োফাইটা **উভচর উদ্ভিদ** হিসেবে পরিচিত। বিজ্ঞানী **ব্রাউন** (Braun) ১৮৬৪ সালে ব্রায়োফাইটা নামটি ব্যবহার করেন। **Bryophyta বর্গের উদ্ভিদকে Bryophytes (ব্রায়োফাইট্স) বলে।** অনেকের মতে, এ

বিভাগে প্রায় ২৪,০০০ প্রজাতি আছে। বাংলাদেশ থেকে এ বিভাগের অন্তর্গত ৩৪টি গোত্রের ৭৪টি গণের ২৪৮টি প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে। ব্রায়োফাইটার সব প্রজাতিতে নিম্নলিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

ব্রায়োফাইটার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Bryophyta)

১। এরা বহুকোষী উদ্ভিদ। এরা অপুষ্পক ও অবীজী অর্থাৎ এদের ফুল, ফল ও বীজ হয় না।

২। এদের দেহ গ্যামিটোফাইট (gametophyte) তথা হ্যাপ্লয়েড। গ্যামিটোফাইট সর্বদাই স্বতন্ত্র ও স্বভোজী উদ্ভিদ।

৩। দেহ থ্যালয়েড অর্থাৎ দেহকে সত্যিকার মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না, তবে মসজাতীয় উদ্ভিদকে 'নরম কাণ্ড ও পাতার' মতো অংশে চিহ্নিত করা যায়।

৪। এদের মূল নেই, তবে মূলের পরিবর্তে এককোষী **রাইজয়েড** (rhizoid) এবং কোনো কোনো প্রজাতিতে বহুকোষী **স্কেল** (scale) থাকে।

৫। এদের দেহে কোনো ভাস্কুলার টিস্যু নেই। দেহ প্যারেনকাইমা টিস্যু দিয়ে গঠিত।

৬। এদের জননাঙ্গ বহুকোষী এবং বন্ধ্যাকোষাবরণ দিয়ে আবৃত। [MAT : 19-20]

৭। স্ত্রীজননাঙ্গকে **আর্কিগোনিয়াম** এবং পুংজননাঙ্গকে **অ্যান্থেরিডিয়াম** বলে। আর্কিগোনিয়ামের আকৃতি ফ্লাস্কের মতো এবং অ্যান্থেরিডিয়ামের আকৃতি গোলাকার, নাশপাতির মতো, বেলনাকার বা গদাকার হয়ে থাকে।

৮। যৌন জনন **উগ্যামাস** প্রকৃতির অর্থাৎ বড়ো নিশ্চল স্ত্রী গ্যামিটের (ডিম্বাণু) সাথে ক্ষুদ্র ও সচল পুং গ্যামিটের (শুক্রাণু) মিলন ঘটে।

৯। শুক্রাণু দ্বিফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট।

১০। নিষেকের জন্য জলীয় মাধ্যমের প্রয়োজন হয়।

১১। এদের ভ্রূণ বহুকোষী, ভ্রূণ স্ত্রী জননাঙ্গের অভ্যন্তরে থাকে।

১২। স্পোরোফাইট গ্যামিটোফাইটের ওপর পূর্ণ বা আংশিক নির্ভরশীল এবং সর্বদাই গ্যামিটোফাইটের সাথে সংযুক্ত থাকে। উৎপন্ন স্পোর একই আকার আকৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ **হোমোস্পোরাস** (homosporus)

১৩। জীবনচক্রে গ্যামিটোফাইট প্রধান এবং স্পোরোফাইট গৌণ।

১৪। স্পোর অঙ্কুরিত হয়ে সরাসরি থ্যালাস গঠন বা প্রোটোনেমা উৎপন্ন করে। [MAT: 18-19]

ব্রায়োফাইটা নামটি এসেছে দু'টি গ্রিক শব্দ হতে। গ্রিক *Bryon* অর্থ মস এবং *phyton* অর্থ উদ্ভিদ। মস এবং এর সাথে মিলসম্পন্ন উদ্ভিদসমূহ ব্রায়োফাইটা বিভাগের অন্তর্গত। এ বিভাগের উদ্ভিদসমূহকে **তিনটি শ্রেণিতে** বিন্যস্ত করা হয়েছে; যথা: (i) **হেপাটিকি** (Hepaticae), (ii) **অ্যান্থোসিরোটি** (Anthocerotae) এবং (iii) **মাসাই** (Musci)।

ব্রায়োফাইটের আদি বৈশিষ্ট্য : (১) উদ্ভিদ হ্যাপ্লয়েড, (২) অধিকাংশই থ্যালয়েড, (৩) এদের সত্যিকার মূল নেই, (৪) ভাস্কুলার টিস্যু নেই, (৫) এরা হোমোস্পোরাস।

ব্রায়োফাইটের উন্নত বৈশিষ্ট্য : *Anthoceros* নামক ব্রায়োফাইটা উদ্ভিদের ক্যাপসিউলে অবস্থিত কলুমেলা, স্টোম্যাটাযুক্ত এপিডার্মিস, ক্যাপসিউলের গোড়ায় ভাজক টিস্যুর অবস্থান এগুলো হলো উন্নত বৈশিষ্ট্য।

ব্রায়োফাইটা উভচর উদ্ভিদ : এদের অনেক সদস্যই আর্দ্র স্থলজ পরিবেশে জন্মায়। কিন্তু পানির সাহায্য ছাড়া জনন, বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে না, তাই এরা উভচর (amphibious) উদ্ভিদ। স্থলজ পরিবেশে জন্মালেও এদের জীবনচক্রের একটি বিশেষ ধাপ পানির ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ এদের যৌন জননের জন্য পানির উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজন। জীবনচক্র সম্পন্ন করার সময় এদের শুক্রাণু পানিতে সাঁতার কেটে ডিম্বাণুর নিকট উপস্থিত হয় এবং পানির উপস্থিতিতে **নিষেকক্রিয়া** সম্পন্ন করে। এরাও জলজ উদ্ভিদের ন্যায় পানি শোষণ করে এবং দেহে জলজ উদ্ভিদের ন্যায় বায়ুরন্ধ্র থাকে। এ কারণে **ব্রায়োফাইটাকে উভচর উদ্ভিদ বলা হয়ে থাকে।**

[MAT:14-15]

Genus : *Riccia* (রিকশিয়া)

Riccia, Hepaticae শ্রেণির অন্তর্গত একটি গণ। *Riccia* উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতি বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই জন্মে থাকে এবং বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় কিন্তু ক্ষুদ্রাকার বলে আমরা এদেরকে সাধারণত লক্ষ্য করি না, চিনিও না। এদের সাথে আমরা তেমন পরিচিত নই। *Riccia* একটি বড়ো গণ। প্রায় ২০০টি প্রজাতি নিয়ে এই গণ গঠিত। এর মধ্যে শুধুমাত্র *Riccia fluitans* ভাসমান জলজ। **Hepaticae শ্রেণির ব্রায়োফাইটস সদস্যদেরকে লিভারওয়ার্ট** (Liverwort) বলে। এদের দেহ অর্থাৎ থ্যালাসের আকৃতি মানুষের লিভার (যকৃত)-এর সাথে কিছুটা মিল সম্পন্ন হওয়াতে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে *Riccia* গণের ৪৫টি প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে। নতুন প্রজাতির মধ্যে *R. bengalensis, R. dhakensis, R. chittagonensis, R. gangestica, R. personii* উল্লেখযোগ্য।

আবাসস্থল : *Riccia* গণের বিভিন্ন প্রজাতি স্যাঁতসেঁতে মাটিতে, আর্দ্র প্রাচীরের গায়ে জন্মে থাকে। নদীতীরে বালিতে *Riccia* জন্মিতে দেখা যায়। *Riccia fluitans* ছোটো ছোটো ডোবা-পুকুরের পানিতে ভাসমান অবস্থায় দেখা যায়। বর্ষাকালেই *Riccia* অধিক জন্মায়।

শ্রেণিবিন্যাস

Kingdom : Plantae
Grade : Bryophyta
Division : Bryophyta
Class : Hepaticae
Order : Marchantiales
Family: Ricciaceae
Genus : *Riccia*

***Riccia*-র শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**

১। উদ্ভিদদেহ **গ্যামিটোফাইটিক** ও **থ্যালয়েড** অর্থাৎ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত নয়।
২। থ্যালাস সবুজ, শায়িত, চ্যাপ্টা এবং বিষমপৃষ্ঠ।
৩। থ্যালাস দ্ব্যগ্র শাখাবিশিষ্ট এবং প্রতি শাখার মাথায় খাঁজযুক্ত।
৪। থ্যালাসের নিম্নপৃষ্ঠে দু প্রকার **এককোষী মসৃণ** ও **অমসৃণ রাইজয়েড** এবং বহুকোষী **স্কেল** বা শল্ক বিদ্যমান।
৫। স্পোরোফাইটিক দশা সরল প্রকৃতির এবং গ্যামিটোফাইটের ওপর নির্ভরশীল।
৬। অভ্যন্তরীণ টিস্যু ওপরের পৃষ্ঠের দিকে দণ্ডাকার (ফাঁকে ফাঁকে বায়ু প্রকোষ্ঠযুক্ত) **ফটোসিন্থেটিক অঞ্চল** এবং নিচের পৃষ্ঠের দিকে অবিচ্ছিন্ন কোষের **সঞ্চয়ী অঞ্চল**-এ বিভক্ত।
৭। স্ত্রী জননাঙ্গ **আর্কিগোনিয়াম**, পুং জননাঙ্গ **অ্যান্থেরিডিয়াম** এবং স্পোরোফাইট **হোমোস্পোরাস** (সব স্পোর একই রকম)।
৮। আর্কিগোনিয়াম দেখতে ফ্লাস্কের মতো এবং অ্যান্থেরিডিয়ামের আকৃতি নাশপাতির মতো; গোলাকার, ডিম্বাকার বা বেলনাকার।

বাহ্যিক গঠন বৈশিষ্ট্য : *Riccia* গ্যামিটোফাইটিক উদ্ভিদ। এদের দেহ থ্যালয়েড অর্থাৎ দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না। থ্যালাসটি সবুজ, শায়িত এবং বিষমপৃষ্ঠ। থ্যালাস দ্ব্যগ্র শাখাবিশিষ্ট। সাধারণত কতগুলো *Riccia* থ্যালাস একত্রে গোলাপের পাপড়ির মতো গোলাকার চক্র করে অবস্থান করে। এ অবস্থাকে **রোজেট** বলে। থ্যালাসের ওপর পৃষ্ঠে লম্বালম্বিভাবে **মধ্যশিরা** আছে এবং শিরা বরাবর লম্বা খাঁজ (dorsal furrow) আছে। থ্যালাসের প্রতিটি শাখার শীর্ষে একটি খাঁজ আছে, একে **অগ্রস্থ খাঁজ** (apical notch) বলে। থ্যালাসের নিচের পৃষ্ঠ থেকে বহুকোষী স্কেল এবং এককোষী রাইজয়েড সৃষ্টি হয়। রাইজয়েড মসৃণ এবং অমসৃণ (smooth & tuberculate)-এ দু'প্রকার হয়। থ্যালাসকে মাটির সাথে আটকিয়ে রাখা এবং মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করা স্কেল ও রাইজয়েড এর কাজ। *Riccia*-এর স্পোরোফাইট সর্বাপেক্ষা সরল এবং সম্পূর্ণরূপে গ্যামিটোফাইটের ওপর নির্ভরশীল। স্পোরোফাইট শুধুমাত্র গোলাকার **ক্যাপসিউল**-এ গঠিত যা থ্যালাসে নিমজ্জিত থাকে।

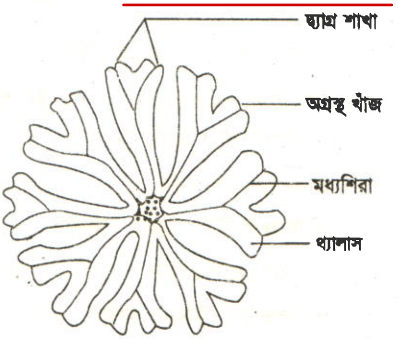

চিত্র ৬.১ : *Riccia* থ্যালাস-এর বাহ্যিক গঠন।

Riccia-র **অভ্যন্তরীণ গঠন (থ্যালাসের প্রস্থচ্ছেদ) :** প্রস্থচ্ছেদে থ্যালাসকে তিনটি পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত দেখা যায় : (i) দিকে ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত **ফটোসিনথেটিক অঞ্চল তথা আত্তীকরণ অঞ্চল**, (ii) নিচের দিকে বর্ণহীন **সঞ্চয়ী অঞ্চল** এবং (iii) **নিম্নত্বক**।

(i) **ফটোসিনথেটিক অঞ্চল তথা আত্তীকরণ অঞ্চল (Photosynthetic or assimilatory zone) :** থ্যালাসের ওপরের পৃষ্ঠের দিকে ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত খাড়া কোষের সারি নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলে ফটোসিনথেসিস হয় এবং খাদ্য তৈরি

হয়। ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত এ সারিগুলোকে **আত্তীকরণ সূত্র** (assimilatory filament) বলে। এসব আত্তীকরণ সূত্রের মধ্যবর্তী সরু ও লম্বা নালির ন্যায় বায়ুপূর্ণ স্থানকে **বায়ু প্রকোষ্ঠ** (air chamber) বলে। প্রতিটি বায়ু প্রকোষ্ঠ একটি ছিদ্রপথে বাইরের সাথে উন্মুক্ত থাকে। এ ছিদ্রপথকে **বায়ুছিদ্র** (air pore) বলে। আত্তীকরণ সূত্রের বাইরের কোষগুলো কিছুটা বড়ো ও ক্লোরোপ্লাস্টবিহীন থাকে। বর্ণহীন এ কোষগুলো থ্যালাসের উপরিভাগে একটি অসম্পূর্ণ **ঊর্ধ্বত্বক** (upper epidermis) গঠন করে। বর্ণহীন একসারি কোষ দিয়ে থ্যালাসের **ঊর্ধ্বত্বক** গঠিত।

(ii) সঞ্চয়ী অঞ্চল (Storage zone) : থ্যালাসের ফটোসিনথেটিক অঞ্চলের নিচে এ অঞ্চল অবস্থিত। এ অঞ্চলটি কয়েক সারি বর্ণহীন **প্যারেনকাইমা** কোষ দ্বারা গঠিত এবং সাধারণত **আন্তঃকোষীয়** ফাঁক বিবর্জিত। এ সকল কোষে প্রচুর শ্বেতসার কণা সঞ্চিত থাকে।

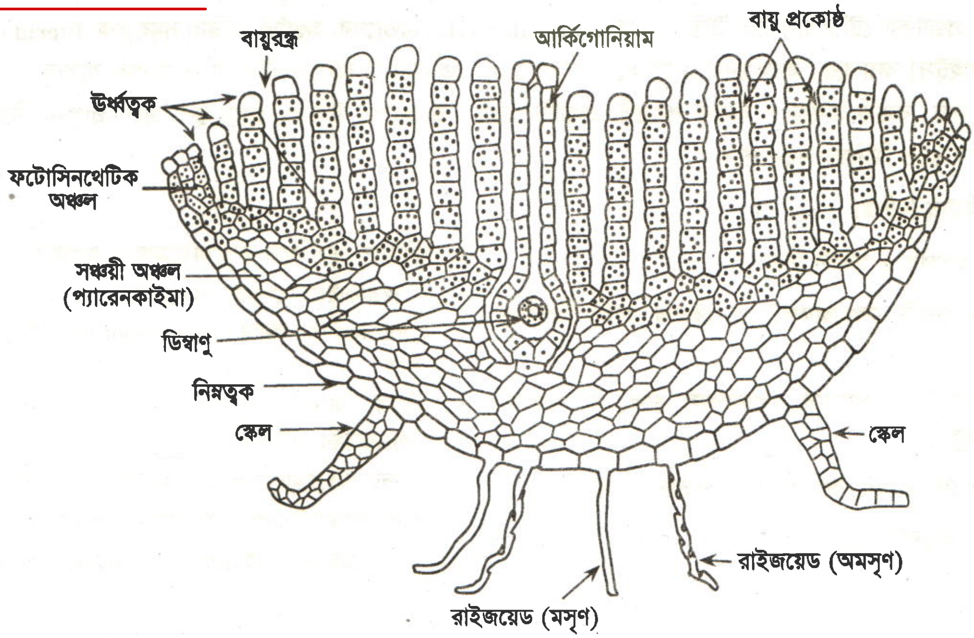

চিত্র ৬.২ : *Riccia* থ্যালাসের প্রস্থচ্ছেদ।

(iii) নিম্নত্বক : একসারি কোষ দিয়ে নিম্নত্বক গঠিত। নিম্নত্বক সুগঠিত। নিম্নত্বক থেকে বহু এককোষী **রাইজয়েড** ও বহুকোষী **শল্ক** বা **স্কেল** নির্গত হয়। রাইজয়েড দু ধরনের; যথা– **মসৃণ** ও **অমসৃণ**।

জনন (Reproduction)

অঙ্গজ জনন : থ্যালাসের পেছনের অংশ মরে গেলে অগ্রভাগের প্রতিটি শাখা স্বতন্ত্র *Riccia* উদ্ভিদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। রাইজয়েডের অগ্রভাগে **গিমা** (gemma) এবং থ্যালাসের ওপর **টিউবার** (tuber) জাতীয় উপবৃদ্ধি সৃষ্টি হতে পারে যা থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

যৌন জনন : *Riccia*-র পুংজননাঙ্গকে **অ্যান্থেরিডিয়াম** এবং স্ত্রীজননাঙ্গকে **আর্কিগোনিয়াম** বলে। নাশপাতি আকৃতির অ্যান্থেরিডিয়ামে **দ্বিফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট শুক্রাণু** এবং ফ্লাস্ক আকৃতির আর্কিগোনিয়ামে নিশ্চল **ডিম্বাণু** উৎপন্ন হয়। সচল শুক্রাণু জল চালিত হয়ে আর্কিগোনিয়ামে অবস্থিত নিশ্চল ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে। নিষিক্ত ডিম্বাণু পরিস্ফুটিত হয়ে সরল ও গোলাকার স্পোরোফাইট গঠন করে। স্পোরোফাইট ক্যাপসিউলে সীমাবদ্ধ থাকে। এর মধ্যে স্পোর উৎপন্ন হয়। স্পোরগুলো আকার-আকৃতিতে একইরূপ হয় অর্থাৎ **হোমোস্পোরাস**। অনুকূল পরিবেশে স্পোর অঙ্কুরিত হয়ে তরুণ *Riccia* থ্যালাস গঠন করে।

***Riccia* : উদ্ভিদের গুরুত্ব :** মাটিতে জৈব পদার্থ সংযোজনে কিছুটা ভূমিকা পালন করে। পরিবেশ দূষণের সূচক হিসেবে কাজ করে। বিবর্তন ধারা বিষয়ে প্রথম স্থলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দিতে সহায়তা করে।

RMDAC

৬.২ : টেরিডোফাইটা (Pteridophyta) বা ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদ

(Gk. *Pteron* = ফার্ন এবং *phyton* = উদ্ভিদ)

গ্রিক শব্দ *Pteron* (**পক্ষল** বা **ডানা** এবং *phyton* (**উদ্ভিদ**) থেকে Pteridophya শব্দের উৎপত্তি। এর আভিধানিক অর্থ হলো পক্ষল বা ডানাবিশিষ্ট উদ্ভিদ। বিভিন্ন শোভাবর্ধনকারী ফার্ন (fern)-এর সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত। ঢেঁকিশাকও (*Dryopteris*) এক ধরনের ফার্ন। সকল ফার্ন ও ফার্নজাতীয় উদ্ভিদ টেরিডোফাইটা বিভাগের অন্তর্গত, তাই টেরিডোফাইটাকে **ফার্নবর্গীয়** উদ্ভিদ বলা হয়ে থাকে। এরা অপুষ্পক ও দেহে ভাস্কুলার টিস্যু থাকায় এদেরকে **ভাস্কুলার ক্রিপ্টোগ্যামস** বলা হয়। Wallace, Sanders ও Ferl-এর Biology (১৯৯৬) অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রায় ১১ হাজার তেইশ (১১০২৩) প্রজাতির টেরিডোফাইট উদ্ভিদ আছে। **Pteridophyta বিভাগের অন্তর্গত উদ্ভিদ(সমূহ)কে Pteridophytes (টেরিডোফাইট্‌স) বলা হয়**। বাংলাদেশ থেকে ৪১ গোত্রের ১৯৫ প্রজাতির টেরিডোফাইট্‌স নথিভুক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ প্রজাতিই স্থলজ, কতক জলজ ও কতক পরাশ্রয়ী প্রজাতি আছে। এ গ্রুপের উদ্ভিদই প্রথম স্থল ভাগে প্রাধান্য বিস্তার লাভ করেছিল প্রায় ৪০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে।

টেরিডোফাইটার বৈশিষ্ট্য

১। এরা অপুষ্পক ও অবীজী উদ্ভিদ।

২। প্রধান দেহটি **স্পোরোফাইট** বা **রেণুধর** অর্থাৎ ডিপ্লয়েড (2n)।

৩। গ্যামিটোফাইট পর্যায়কে **প্রোথ্যালাস** বলে, যা থ্যালাস প্রকৃতির।

৪। এদের দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায়।

৫। এদের **ভাস্কুলার টিস্যু** আছে।

৬। এদের ভ্রূণ সৃষ্টি হয়।

৭। অধিকাংশ প্রজাতিতে কাণ্ড **রাইজোম**-এ রূপান্তরিত হয়।

৮। স্পোরোফাইটে **স্পোর** উৎপন্ন হয়, যা **সম** (homosporous) বা **অসম** (heterosporous) আকৃতির হতে পারে।

৯। এদের জননাঙ্গ বহুকোষী এবং জননাঙ্গের চারদিকে বন্ধ্যাকোষের বেষ্টনী থাকে।

১০। এদের পুংগ্যামিট সচল এবং অ্যান্থেরিডিয়ামে উৎপন্ন হয়।

১১। এদের স্ত্রীগ্যামিট নিশ্চল এবং আর্কিগোনিয়ামে উৎপন্ন হয়।

১২। জীবনচক্রে সুস্পষ্ট **হিটারোমরফিক** জনুঃক্রম বিদ্যমান।

Genus : *Pteris* (টেরিস)

Pteris-এর শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১। দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত।

২। কাণ্ড **রাইজোম** (rhizome)-এ রূপান্তরিত হয়।

৩। রাইজোম **র‍্যামেন্টা নামক শল্কপত্র** দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে।

৪। পাতা যৌগিক, কচি অবস্থায় পাতাগুলো **কুণ্ডলিত** থাকে।

৫। সব স্পোর একই রকম (হোমোস্পোরাস)। [DAT: 23-24]

৬। স্পোরাঞ্জিয়া একত্রিত হয়ে পত্রকের কিনারায় **সোরাস** (sorus) গঠন করে।

৭। স্পোরাঞ্জিয়াম **ফলস্‌ ইন্ডুসিয়াম** (false inducium) দিয়ে ঢাকা থাকে।

৮। **প্রোথ্যালাস** (গ্যামিটোফাইট) সবুজ, হৃৎপিণ্ডাকার এবং সহবাসী।

৯। রাইজোমের নিচ থেকে অস্থানিক মূল বের হয়।

১০। পাতায় র‍্যাকিস (rachis) থাকে।

শ্রেণিবিন্যাস

Kingdom : Plantae
Grade : Tracheophyta
Division : Filicinophyta
Class : Filicineae
Order : Filicales
Family : Polypodiaceae
Genus : *Pteris*

Riccia

Microlepia speluncae

Marchantia

Drynaria quercifolia

Moss plant

Pteris vittata

চিত্র : কয়েকটি ব্রায়োফাইট ও টেরিডোফাইট উদ্ভিদ (ফটো : ড. জসীম, আমানুল্লাহ)

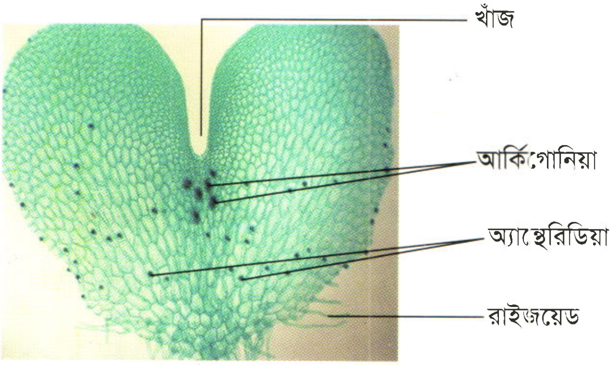

ফার্ন প্রোথ্যালাস

সারসিনেট ভার্নেশন

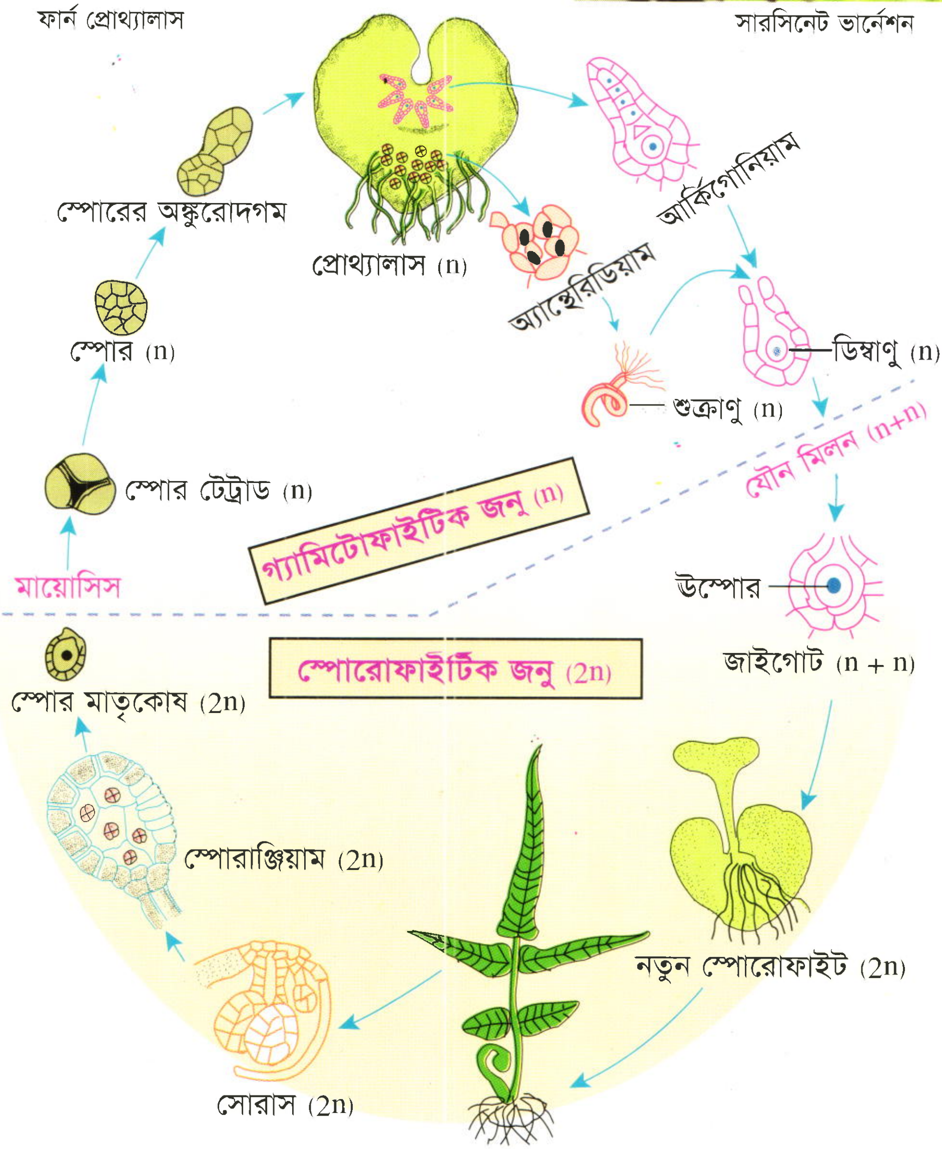

চিত্র : *Pteris* উদ্ভিদের জীবন চক্র

১১। *Pteris* উদ্ভিদ *Pteridophyte,* কারণ এটি ফটোসিন্থেটিক (তাই ছত্রাক নয়), ভাস্কুলার (তাই শৈবাল বা মসবর্গীয় নয়), অপুষ্পক (তাই নগ্নবীজী বা আবৃতবীজী উদ্ভিদ নয়)।

বাংলাদেশে *Pteris* উদ্ভিদ একটি পরিচিত ফার্ন উদ্ভিদ। খোলা ও উন্মুক্ত জায়গা অর্থাৎ রোদে জন্মাতে পছন্দ করে বলে *Pteris* উদ্ভিদ **সানফার্ন** নামে পরিচিত। বাংলাদেশে *Pteris* এর প্রায় ১৬টি প্রজাতি জন্মে থাকে। যেমন-*Pteris vittata, P. longifolia* ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশি জন্মায় *Pteris vittata*।

আবাসস্থল (Habitat) : *Pteris* সাধারণত পুরাতন ও ভাঙা স্যাঁতসেঁতে প্রাচীরের গায়ে জন্মায়। পুরাতন ইটের স্তূপেও এরা ভালো জন্মায়। প্রাচীরের গায়ে এবং ইটের স্তূপে জন্মায় বলে এরা **অর্ধবায়বীয়** বা **সাবএরিয়াল**। *Pteris* গণের প্রায় ২৫০টি প্রজাতি রয়েছে।

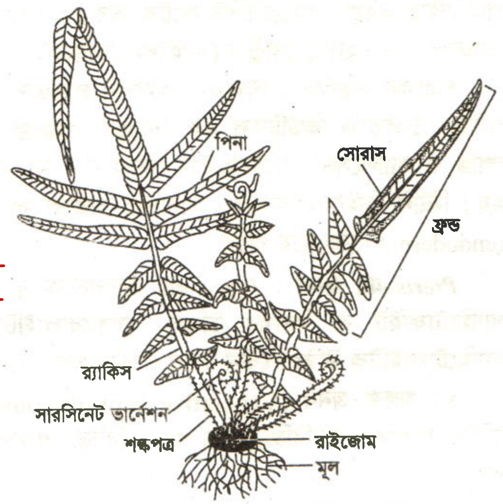

চিত্র ৬.৩ : একটি *Pteris* উদ্ভিদ।

***Pteris*-এর দৈহিক গঠন (Vegetative structure of *Pteris*) :** *Pteris* এর প্রধান উদ্ভিদ রেণুধর বা স্পোরোফাইটিক বা ডিপ্লয়েড। এদের দেহ মূল, কাণ্ড এবং পাতায় বিভক্ত। কাণ্ড **রাইজোম** (rhizome) (রূপান্তরিত ভূনিম্নস্থ কাণ্ড) জাতীয় এবং আবাসভূমির কয়েক সেন্টিমিটার গভীরে জন্মায়। এটি দেখতে লম্বা এবং এর বৃদ্ধি অনির্দিষ্ট। রাইজোমের নিম্নতল হতে সূক্ষ্ম স্বল্প শাখাযুক্ত অস্থানিক মূল গুচ্ছাকারে বের হয়। পাতা চির সবুজ এবং পক্ষল যৌগিক। ফার্নের পাতাকে **ফ্রন্ড** (frond) বলে। মুকুল অবস্থায় পাতা কীভাবে বিন্যস্ত থাকে তাকে বলা হয় **ভার্নেশন** বা মুকুলপত্র বিন্যাস। ফার্নের পাতার মুকুল অবস্থায় কুণ্ডলী পাকানো অবস্থায় থাকে যাকে বলা হয় **সারসিনেট ভার্নেশন** (circinate vernation)। কুণ্ডলিত কচি পাতাকে **ক্রোজিয়ার** (crozier) বলে। পত্র যৌগপত্র এবং প্রতিটি পত্রকখণ্ডকে **পিনা** (pina) বলে। পিনা প্রায় অবৃন্তক, সাধারণত অপজিট, কখনো কখনো কিছুটা একান্তরভাবে অবস্থিত থাকে। প্রতিটি পিনা অবৃন্তক, সরু লম্বাটে (linear shaped) এবং কিনারা মসৃণ। শীর্ষক পিনা সর্বাধিক লম্বা। প্রতিটি পত্রক সরল, বল্লমাকার ও অবৃন্তক এবং পাতার অক্ষ বা র‍্যাকিস (rachis)-এর দু' পাশে জোড়ায় জোড়ায় সাজানো থাকে। রাইজোম এক প্রকার অসংখ্য বাদামি রঙের **শল্কপত্র** দিয়ে আবৃত থাকে। শল্কপত্রকে **র‍্যামেন্টাম** (ramentum) বলে। পরিণত পত্রকের নিম্নতলের কিনারায় **সোরাই** (sori) উৎপন্ন হয়।

[MAT: 15-16]

***Pteris*-এর অভ্যন্তরীণ গঠন (Internal structure of *Pteris*)**

রাইজোমের (কাণ্ড) অন্তর্গঠন : রাইজোম কাণ্ডের সর্ববাইরে **প্যারেনকাইমা** কোষের একস্তরবিশিষ্ট এপিডার্মিস বা বহিঃত্বক অবস্থিত। বহিঃত্বক দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় দুস্তরবিশিষ্ট **হাইপোডার্মিস** (অধঃত্বক) এবং হাইপোডার্মিস দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় বহুস্তরবিশিষ্ট **কর্টেক্স** অবস্থিত। কর্টেক্স-এ একাধিক **ভাস্কুলার বান্ডল** আছে। ভাস্কুলার বান্ডল **হ্যাড্রোসেন্ট্রিক** (hadrocentric) কারণ এর কেন্দ্রে জাইলেম এবং এর চারদিকে ফ্লোয়েম অবস্থিত।

র‍্যাকিস-এর অন্তর্গঠন : র‍্যাকিসের প্রস্থচ্ছেদে বাইরে **এপিডার্মিস**, এপিডার্মিস দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় **স্ক্লেরেনকাইমা** কোষের **হাইপোডার্মিস** (অধঃত্বক) অবস্থিত। হাইপোডার্মিস দিয়ে

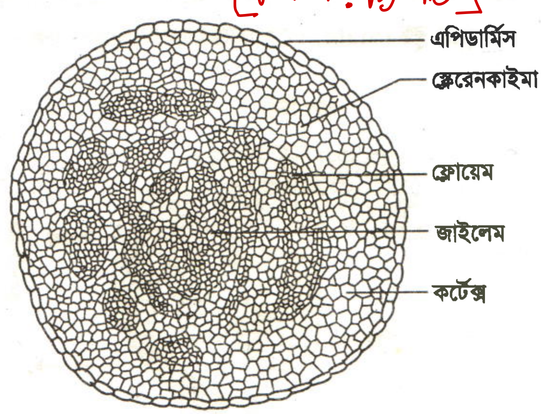

চিত্র ৬.৪ : *Pteris*-এর রাইজোম কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ।

ফার্নজাতীয় উদ্ভিদসমূহকে পঞ্চরাজ্য শ্রেণিবিন্যাসে Plantae রাজ্যের গ্রেড ট্রাকিওফাইটার অন্তর্গত তিনটি বিভাগে রাখা হয়েছে। *Pteris,* বিভাগ Filicinophyta-এর অন্তর্গত। Margulis শ্রেণিবিন্যাসে Pteridophyta বলে কোনো বিভাগ, গ্রেড বা শ্রেণি নেই।]

পরিবেষ্টিত অবস্থায় বহুস্তরবিশিষ্ট **কর্টেক্স** অবস্থিত এবং কর্টেক্স টিস্যুতে **অশ্বক্ষুরাকৃতির স্টিলি** (পরিবহণ টিস্যুগুচ্ছ) অবস্থিত। ভাস্কুলার বান্ডল **হ্যাড্রোসেন্ট্রিক** (জাইলেম কেন্দ্রিক)।

পত্রকের অন্তর্গঠন : দীর্ঘাকার পত্রকের প্রস্থচ্ছেদ করলে দেখা যায়, **ঊর্ধ্বত্বক** ও **নিম্নত্বক** উভয়ই একসারি কোষ দিয়ে গঠিত। ঊর্ধ্বত্বকে **কিউটিকল** এবং নিম্নত্বকে **পত্ররন্ধ্র** বিদ্যমান। উভয় ত্বকের মাঝখানে **মেসোফিল স্তর** বিদ্যমান। এখানে **স্পঞ্জি** ও **প্যালিসেড** প্যারেনকাইমা বিদ্যমান। মেসোফিল প্যারেনকাইমা কোষগুলো ক্লোরোফিলযুক্ত এবং বায়ুগহ্বরবিশিষ্ট হয়। স্টিলি জাইলেমকেন্দ্রিক। মধ্যশিরা অঞ্চলে সংযুক্ত ভাস্কুলার বান্ডল বিদ্যমান যা **পরিচক্র** (pericycle) ও **অন্তঃত্বক** (endodermis) যুক্ত হয়ে থাকে।

***Pteris*-এর জনন :** *Pteris*-এর জীবনচক্রে দু ধরনের উদ্ভিদ জন্মে। যথা—স্পোরোফাইট বা রেণুধর উদ্ভিদ এবং গ্যামিটোফাইট বা লিঙ্গধর উদ্ভিদ। স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদে **অঙ্গজ** ও **অযৌন** জনন প্রক্রিয়া ঘটে থাকে এবং গ্যামিটোফাইটিক উদ্ভিদে **যৌন** জনন প্রক্রিয়া ঘটে থাকে।

১। অঙ্গজ জনন (Vegetative reproduction) : অনেক সময় পরিণত রাইজোমের অংশবিশেষ মরে যায় এবং অপরিণত শাখাগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিচ্ছিন্ন শাখাগুলো নতুন মূল ও পাতা সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথক স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদে পরিণত হয়।

২। অযৌন জনন (Asexual reproduction) : *Pteris* উদ্ভিদে **স্পোর** সৃষ্টির মাধ্যমে অযৌন জনন সম্পন্ন হয়। *Pteris* উদ্ভিদ পরিণত হলে এর পত্রক তথা পিনার নিম্নতলের দু'কিনারা বরাবর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **স্পোরাঞ্জিয়া** (sporangia, একবচনে sporangium) উৎপন্ন হয়। স্পোরাঞ্জিয়ামের অভ্যন্তরে **রেণু** বা **স্পোর** (spore) নামক অযৌন জনন কোষ (asexual reproductive bodies) উৎপন্ন হয়। স্পোরাঞ্জিয়াগুলো গুচ্ছাকারে অবস্থান করে এবং স্পোরাঞ্জিয়ামের গুচ্ছকে **সোরাস** (sorus, বহুবচনে sori) বলা হয়। প্রতিটি সোরাস দেখতে বাদামি বর্ণের ও বৃক্কাকার। যে টিস্যু হতে স্পোরাঞ্জিয়াম উৎপন্ন হয় সে টিস্যুকে **প্লাসেন্টা** (placenta) বা **অমরা** বলে। **পত্রক** বা **পিনার** কিনারা ভেতরের দিকে একটু বেঁকে এসে সোরাইকে ঢেকে রাখে। ফলক প্রান্তের এ ঢাকনি অংশকে **ফল্‌স্ ইন্ডুসিয়াম** (false indusium) বলা হয়। সোরাস উৎপন্নকারী পাতাকে **স্পোরোফিল** (sporophyll) বলে। পরিণত স্পোরাঞ্জিয়াম একটি **বৃন্ত** (স্পোরাঞ্জিয়োফোর) এবং একটি উপবৃত্তাকার **ক্যাপসিউল** অংশ নিয়ে গঠিত। বৃন্তের মাথায় ক্যাপসিউল অবস্থিত। ক্যাপসিউল নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে গঠিত:

(i) অ্যানুলাস (Annulus) : ক্যাপসিউল প্রাচীরের অধিকাংশ কাইটিনযুক্ত ও পুরু এক কোষস্তরবিশিষ্ট আবরণে আবৃত থাকে। এ পুরু আবরণকে অ্যানুলাস বলে। এটি পানিগ্রাহী।

(ii) স্টোমিয়াম (Stomium) : ক্যাপসিউলের বৃন্ত সংলগ্ন কিছু অংশে পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট বলয়াকার কোষ থাকে, এ অংশকে স্টোমিয়াম বলে। স্পোর নির্গমনের সময় স্টোমিয়াম বরাবর স্পোরাঞ্জিয়াম ফেটে যায় এবং স্পোর নির্গমন হয়।

(iii) বৃন্ত (Stalk) : স্পোরাঞ্জিয়ামের গোড়ায় একটি খাটো বৃন্ত আছে।

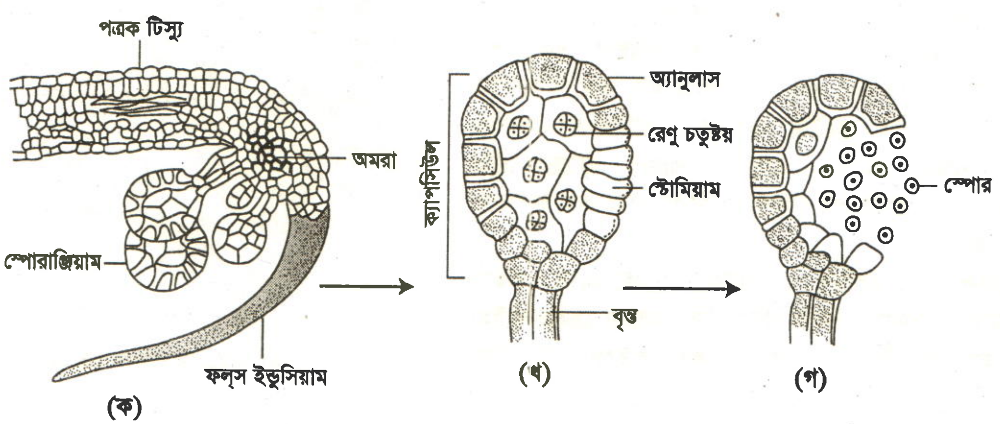

চিত্র ৬.৫ : (ক) সোরাস বরাবর ফার্ন পত্রকের প্রস্থচ্ছেদ; (খ) একটি স্পোরাঞ্জিয়াম; (গ) স্পোর বিদারণ।

RMDAC

স্পোর উৎপাদন ও বিস্তার : ক্যাপসিউলের ভেতরের টিস্যুকে বলা হয় **স্পোরোজেনাস টিস্যু** (sporogenous tissue)। এ টিস্যু হতে **স্পোর মাতৃকোষ** উৎপন্ন হয়। স্পোর মাতৃকোষ ডিপ্লয়েড (2n)। প্রতিটি স্পোরাঞ্জিয়ামে ১৬টি মাতৃকোষ থাকে। **মায়োসিস** বিভাজনের মাধ্যমে স্পোর মাতৃকোষ হতে হ্যাপ্লয়েড (n) স্পোর উৎপন্ন হয়। একটি স্পোরাঞ্জিয়াম থেকে **৬৪টি স্পোর** সৃষ্টি হয়। পরিণত স্পোরগুলো গাঢ় বাদামি বর্ণের এবং একই বৈশিষ্ট্যের। এগুলো দ্বিস্তরী ও **জার্মপোর** (germpore) যুক্ত। স্পোর সৃষ্টি হওয়ায় স্পোরাঞ্জিয়ামে পানি ধারণক্ষমতা কমে যায় ফলে স্পোরাঞ্জিয়াম শুষ্ক হয়ে যায় এবং অ্যানুলাসের কোষগুলো কুঞ্চিত হতে থাকে। স্পোরাঞ্জিয়াম শুষ্ক হয়ে গেলে এর পশ্চাদ্ভাগের অ্যানুলাসে টান পড়ে এবং স্টোমিয়াম আড়াআড়ি ফেটে যায়। আর্দ্র অ্যানুলাস পুনরায় পূর্বস্থানে ফিরে আসে। অ্যানুলাসের এদিক-ওদিক চলাচলের ফলে স্পোরাঞ্জিয়াম হতে স্পোরের বিস্তার ঘটে এবং স্পোরগুলো বাইরে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্যামিটোফাইটিক উদ্ভিদ : *Pteris* এর স্পোরোফাইট থেকে সৃষ্ট স্পোর বা রেণু হলো লিঙ্গধর বা গ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ। হ্যাপ্লয়েড স্পোর অনুকূল পরিবেশে কোনো আর্দ্র বস্তুর সংস্পর্শে আসলে অঙ্কুরিত হয় এবং ক্রমাগত **মাইটোটিক** বিভাজনের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডাকার সবুজ অঙ্গের সৃষ্টি করে। **এটি ফার্নের গ্যামিটোফাইট। হৃৎপিণ্ডাকার এ গ্যামিটোফাইটকে প্রোথ্যালাস** (prothallus) বলা হয়। প্রোথ্যালাসের নিম্নপৃষ্ঠের নিম্নাংশ হতে অনেক এককোষী **রাইজয়েড** উৎপন্ন হয়। রাইজয়েডগুলো প্রোথ্যালাসকে মাটির সাথে সংযুক্ত করে এবং মাটি হতে প্রোথ্যালাসকে খাদ্যরস সরবরাহ করে। প্রোথ্যালাসের ওপরের দিকে একটি গভীর খাঁজ আছে। একে **অগ্রস্থ খাঁজ** (apical notch) বলে। **প্রোথ্যালাস সবুজ বর্ণের, বহুকোষী, স্বতন্ত্র ও স্বভোজী উদ্ভিদ**। প্রোথ্যালাস **উভলিঙ্গ** অর্থাৎ একই দেহে পুং ও স্ত্রী জনন অঙ্গ অবস্থান করে। প্রোথ্যালাসের অঙ্কীয়তলে খাঁজের কাছে স্ত্রীজননাঙ্গ (**আর্কিগোনিয়াম**) এবং রাইজয়েডের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় পুংজননাঙ্গ (**অ্যান্থেরিডিয়াম**) উৎপন্ন হয়। একই থ্যালাসে পুং ও স্ত্রীজননাঙ্গ থাকে বলে একে **সহবাসী উদ্ভিদও** বলা হয়।

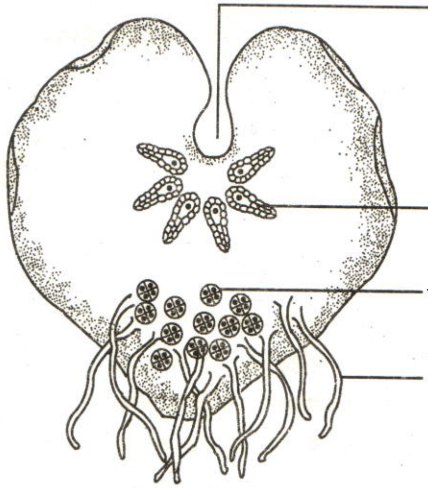

চিত্র ৬.৬ : *Pteris* প্রোথ্যালাস (নিম্নতল)

৩। **যৌন জনন (Sexual reproduction) :** প্রোথ্যালাসে যৌন জনন সম্পন্ন হয়। এর নিম্নতলে খাঁজের কাছাকাছি স্থানে **আর্কিগোনিয়াম** (স্ত্রীজননাঙ্গ) উৎপন্ন হয়। যে অংশ হতে রাইজয়েড উৎপন্ন হয় সে অংশে **অ্যান্থেরিডিয়াম** (পুংজননাঙ্গ) উৎপন্ন হয়, কাজেই **প্রোথ্যালাস সহবাসী**।

আর্কিগোনিয়াম (Archegonium) : স্ত্রীজননাঙ্গকে **আর্কিগোনিয়াম** বলে। আর্কিগোনিয়াম ফ্লাস্ক আকৃতির। এটি একটি **গ্রীবা** (neck) এবং একটি **উদর** (venter) সহযোগে গঠিত। উদরের নিম্নাংশে একটি **ডিম্বাণু** (egg or oosphere) আছে এবং ডিম্বাণুর ওপর একটি **উদরীয় নালিকা কোষ** (ventral canal cell) আছে। গ্রীবায় একাধিক **গ্রীবা নালিকা কোষ** (neck canal cell) আছে। আর্কিগোনিয়াম পরিণত হলে গ্রীবা নালিকা কোষ এবং উদরীয় নালিকা কোষ বিগলিত হয়ে একটি নালি পথ গঠন করে এবং উদরে শুধু ডিম্বাণু থাকে। এ নালি পথটি মিউসিলেজ ও ম্যালিক আসিড দিয়ে পূর্ণ থাকে।

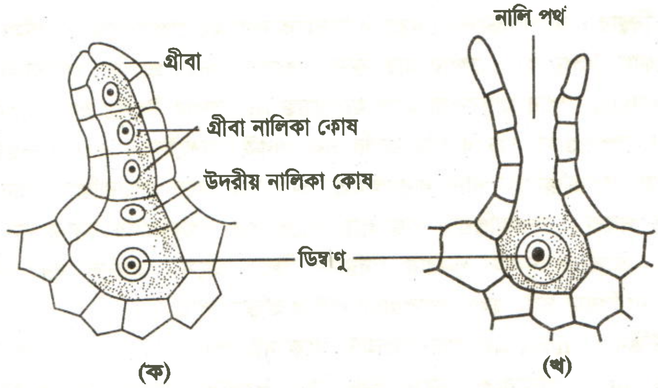

চিত্র ৬.৭ : *Pteris*-এর আর্কিগোনিয়াম (ক) বিভিন্ন অংশ, (খ) নিষেকের জন্য প্রস্তুত।

অ্যান্থেরিডিয়াম (Antheridium) : পুংজননাঙ্গকে **অ্যান্থেরিডিয়াম** বলে। অ্যান্থেরিডিয়াম গোলাকৃতির। এর ভেতরে ২০-৫০টি **শুক্রাণু মাতৃকোষ** বা **অ্যান্ড্রোসাইট** (androcyte) থাকে। মাতৃকোষগুলো একটি বন্ধ্যা আবরণ দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে। আবরণটি ৩টি কোষ দিয়ে গঠিত। গোড়ায় **বলয় কোষ** (ring cell) এবং ওপরে ১টি **ঢাকনা কোষ** (cover cell) থাকে। প্রতিটি শুক্রাণু মাতৃকোষ রূপান্তরিত হয়ে প্যাঁচানো দণ্ডাকার **বহু ফ্ল্যাজেলাযুক্ত শুক্রাণুতে** (antherozoid) পরিণত হয়। অ্যান্থেরিডিয়ামের শীর্ষের আচ্ছাদনকারী ঢাকনা কোষ বিদীর্ণ হয় এবং শুক্রাণুগুলো বের হয়ে ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে শিশির বা বৃষ্টির পানিতে সাঁতার কেটে আর্কিগোনিয়ার সন্নিকটে আসে।

চিত্র ৬.৮ : *Pteris* ফার্নের অ্যান্থেরিডিয়াম এবং শুক্রাণু সৃষ্টি।

নিষেক (Fertilization) : শিশির বিন্দু বা বৃষ্টির পানির সাহায্যে শুক্রাণুসমূহ আর্কিগোনিয়ামে পরিবাহিত হয়। আর্কিগোনিয়াম কর্তৃক ম্যালিক অ্যাসিড নিঃসৃত হয়, ফলে শুক্রাণু ডিম্বাণুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনেক শুক্রাণু আর্কিগোনিয়ামের গ্রীবা নালি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেও মাত্র একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করে। নিষেকক্রিয়ার ফলে ডিপ্লয়েড (2n) **উস্পোর** (oospore) উৎপন্ন হয়। এভাবে নিষেকের ফলে উস্পোরে পূর্ণ ক্রোমোসোম সংখ্যা ফিরে আসে এবং সাথে সাথে ডিপ্লয়েড বা স্পোরোফাইটিক পর্যায় শুরু হয়।

নতুন স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদ (Regeneration of sporophytic plant) : **জাইগোট** বা **উস্পোর স্পোরোফাইটের** প্রথম কোষ। উস্পোর পুনঃ পুনঃ মাইটোটিক কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বহুকোষী ভ্রূণ সৃষ্টি করে। ভ্রূণ ক্রমশ বিকশিত হয়ে মূল, কাণ্ড ও পাতাবিশিষ্ট নতুন স্পোরোফাইট

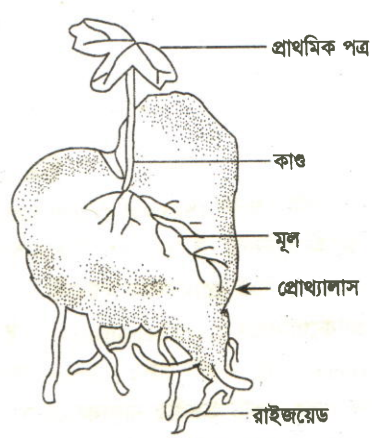

চিত্র ৬.৯ : *Pteris*-এর নতুন স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদ।

RMDAC

উদ্ভিদের জন্ম দেয়। মূল মাটিতে প্রবেশের পর প্রোথ্যালাস শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায় এবং স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদটি পূর্ণ *Pteris* উদ্ভিদে পরিণত হয়।

Pteris উদ্ভিদের জীবনচক্র ও জনুঃক্রম (Life cycle and Alternation of generation of *Pteris*)

কোনো জীবের জন্মাবস্থা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি, বিকাশ, জনন প্রভৃতি পর্যায় অতিক্রম করে পুনরায় ঐ অবস্থার পুনর্জন্ম দেওয়ার চক্রীয় ধারাকে ঐ জীবের **জীবনচক্র** বলে।

কোনো জীবের জীবনচক্র সম্পন্ন করার জন্য পর্যায়ক্রমে ডিপ্লয়েড (2n) বা স্পোরোফাইট (রেণুধর) এবং হ্যাপ্লয়েড (n) বা গ্যামিটোফাইট (লিঙ্গধর) জনুর আবির্ভাবকে জনুঃক্রম বলে। *Pteris* উদ্ভিদের জীবনচক্রে সুস্পষ্টভাবে দুটি জনুর পর্যায়ক্রমিক আবর্তন ঘটে। একটি হলো স্পোরোফাইটিক জনু এবং অপরটি হলো গ্যামিটোফাইটিক জনু। নিচে *Pteris*-এর জনুঃক্রম বর্ণনা করা হলো।

স্পোরোফাইটিক জনু (Sporophytic generation) : *Pteris*-এর উদ্ভিদদেহ **স্পোরোফাইটিক** অর্থাৎ ডিপ্লয়েড (2n)। স্পোরোফাইট প্রজনন ঋতুতে পত্রক কিনারা বরাবর **সোরাস** উৎপন্ন করে। সোরাস হলো স্পোরাঞ্জিয়ামের গুচ্ছ। প্রতিটি স্পোরাঞ্জিয়ামের ক্যাপসিউলের ভেতরে **১৬টি ডিপ্লয়েড স্পোর মাতৃকোষ** (2n) থাকে। স্পোর মাতৃকোষ মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে **৬৪টি হ্যাপ্লয়েড স্পোর (n)** উৎপন্ন করে। স্পোর সৃষ্টির পর ক্যাপসিউলের প্রাচীর বিদীর্ণ করে স্পোরগুলো বেরিয়ে আসে। এভাবে স্পোরোফাইটিক জনুর সমাপ্তি ঘটে।

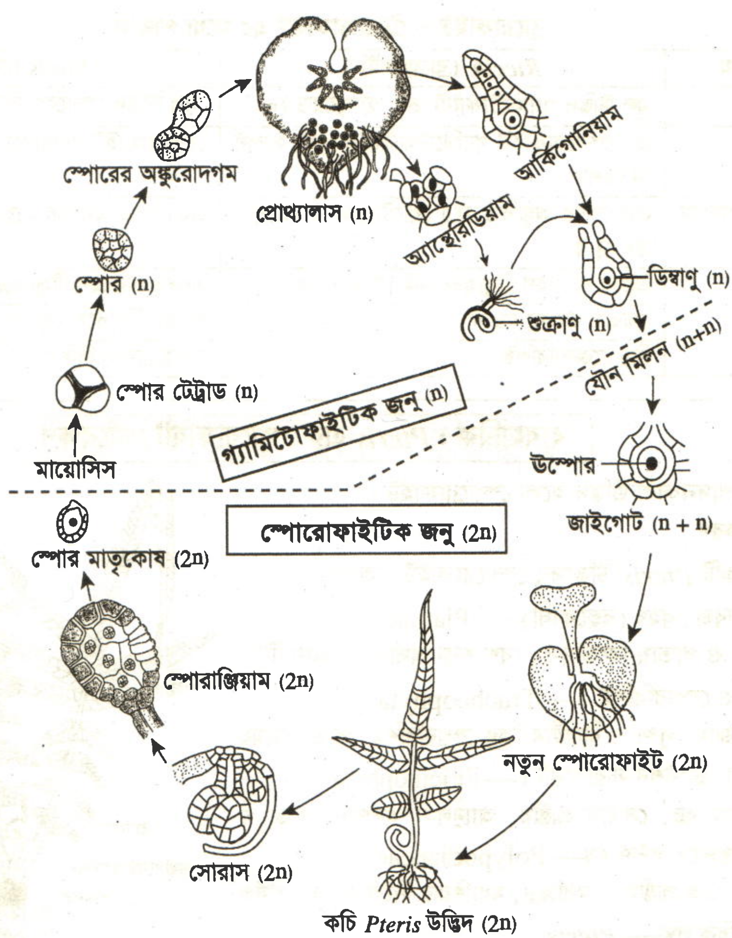

চিত্র ৬.১০ : *Pteris* উদ্ভিদের জীবনচক্র (জনুঃক্রম)।

গ্যামিটোফাইটিক জনু (Gametophytic generation) : স্পোর মাতৃকোষ মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে হ্যাপ্লয়েড (n) স্পোর উৎপন্ন করে যা গ্যামিটোফাইটের প্রথম ধাপ। এ হ্যাপ্লয়েড স্পোর অঙ্কুরিত হয়ে **প্রোথ্যালাস** নামক স্বতন্ত্র গ্যামিটোফাইটিক পর্যায়ের সৃষ্টি করে। প্রোথ্যালাসে সৃষ্ট **আর্কিগোনিয়াম** ও **অ্যান্থেরিডিয়াম** এবং এদের ভেতরে সৃষ্ট **ডিম্বাণু** ও **শুক্রাণু** সবই হ্যাপ্লয়েড। এদের মধ্যে নিষেকের ফলে সৃষ্টি হয় **ডিপ্লয়েড উস্পোর** (2n) যা স্পোরোফাইটিক পর্যায়ের প্রথম ধাপ। উস্পোর অঙ্কুরিত হয়ে এবং ক্রমাগত মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে সৃষ্টি করে **ভ্রূণ** ও পূর্ণাঙ্গ স্পোরোফাইটিক *Pteris* উদ্ভিদ। এভাবে *Pteris*-এর জীবনচক্রে পর্যায়ক্রমে **স্পোরোফাইটিক ও গ্যামিটোফাইটিক জনুর আবির্ভাব ঘটে।** *Pteris*-এর জীবনচক্রের **স্পোরোফাইট পর্যায় দীর্ঘ, গ্যামিটোফাইট পর্যায় বেশ সংক্ষিপ্ত এবং উভয় পর্যায় আকার-আকৃতিতে ভিন্ন প্রকৃতির ও স্বতন্ত্র। তাই এরূপ জনুঃক্রমকে বিষমাকৃতির বা হিটারোমরফিক জনুঃক্রম (heteromorphic alternation of generation) বলে।**

যে জনুঃক্রমে রেণুধর বা স্পোরোফাইটিক এবং লিঙ্গধর বা গ্যামিটোফাইটিক, দুটি দশাই সমান তাকে ডিপ্লোবায়োন্টিক জনুঃক্রম বলে। আবার যে ডিপ্লোবায়োন্টিক জনুঃক্রমে রেণুধর ও লিঙ্গধর দশারূপে আকার-আকৃতিগতভাবে ভিন্ন ধরনের হয় তাকে **হিটারোবায়োন্টিক জনুঃক্রম** বলে।

***Pteris*-এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব :** ১। *Pteris* উদ্ভিদ শাক হিসেবে খাওয়া যায়। ২। ঘর সাজানোর কাজেও ব্যবহার করা হয়। ৩। সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ৪। প্রকৃতিতে উৎপাদক হিসেবে কাজ করে।

ব্রায়োফাইট ও টেরিডোফাইট এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	*Riccia* (ব্রায়োফাইট)	*Pteris* (টেরিডোফাইট)
১. উদ্ভিদদেহ	মূল উদ্ভিদ গ্যামিটোফাইট তথা হ্যাপ্লয়েড (n)।	মূল উদ্ভিদ স্পোরোফাইট তথা ডিপ্লয়েড (2n)।
২. নির্ভরশীলতা	এর স্পোরোফাইট গ্যামিটোফাইটের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।	স্পোরোফাইট ও গ্যামিটোফাইট স্বতন্ত্র উদ্ভিদ।
৩. স্পোরের অঙ্কুরোদগম	এর স্পোর অঙ্কুরিত হয়ে প্রোটোনেমা বা থ্যালাস উৎপন্ন করে।	এর স্পোর অঙ্কুরিত হয়ে প্রোথ্যালাস উৎপন্ন করে।
৪. ভাস্কুলার টিস্যু	এদের পরিবহণ টিস্যুগুচ্ছ নেই (অভাস্কুলার)।	এদের পরিবহণ টিস্যুগুচ্ছ আছে (ভাস্কুলার)।
৫. সোরাস	সোরাস উৎপন্ন হয় না।	পাতার নিম্নপৃষ্ঠে সোরাস উৎপন্ন হয়।
৬. শুক্রাণু	দ্বিফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট।	বহু ফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট।

ব্যবহারিক : *Pteris* এর স্পোরোফাইট পর্যবেক্ষণ

সূত্র : স্পোর উৎপাদনকারী উদ্ভিদ হলো স্পোরোফাইট।

কারণসহ শনাক্তকরণ

প্রদত্ত নমুনাটি একটি *Pteris* উদ্ভিদের স্পোরোফাইট ; কারণ—

(i) নমুনাটি সবুজ, বৃহৎ (বহুকোষী) — Plantae

(ii) মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভেদিত, বেশ শক্ত অর্থাৎ পরিবহণ টিস্যু বিদ্যমান ও স্পোরবিশিষ্ট — Tracheophyta

(iii) কাণ্ড রাইজোম, পুষ্প ও বীজহীন কিন্তু স্পোরবিশিষ্ট, পাতা পত্রময় (foliage), ভার্নেশন সারসিনেট। — Filicinophyta

(iv) স্পোরাঞ্জিয়াম বহু, সোরাস প্রান্তীয়, অ্যানুলাস অসম্পূর্ণ, খাড়া ও বৃন্তযুক্ত, প্রস্থভাবে বিদীর্ণ হয়— Polypodiaceae

(v) ইন্ডুসিয়াম পত্রক প্রান্তীয়, নিরবচ্ছিন্ন, মধ্যশিরার দিকে উন্মুক্ত, শীর্ষক পত্রক সর্বাধিক লম্বা— *Pteris*

সার-সংক্ষেপ

ব্রায়োফাইটা : উদ্ভিদদেহ লিঙ্গধর (n)। রেণুধর উদ্ভিদ (2n) সবসময় লিঙ্গধর উদ্ভিদের সাথে যুক্ত থাকে। ব্রায়োফাইটার মূল থাকে না। এর পরিবর্তে রাইজয়েডও শল্ক থাকে। ব্রায়োফাইটার স্পোরোফাইট গ্যামিটোফাইটের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং হোমোস্পোরাস।

প্রোথ্যালাস : ফার্ন উদ্ভিদের গ্যামিটোফাইটকে প্রোথ্যালাস বলা হয়। হ্যাপ্লয়েড স্পোর অঙ্কুরোদগমের মাধ্যমে প্রোথ্যালাস সৃষ্টির সূচনা হয়। পূর্ণাঙ্গ প্রোথ্যালাস সবুজ, চ্যাপ্টা, বিষমপৃষ্ঠ এবং হৃৎপিণ্ডাকার। প্রোথ্যালাসের অঙ্কীয়তলে খাঁজের কাছে স্ত্রীজননাঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং রাইজয়েডের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় পুংজননাঙ্গ সৃষ্টি হয়। পুংরেণু ও স্ত্রীরেণুর যৌন মিলনের মাধ্যমে স্ত্রীজননাঙ্গে জাইগোটের সূচনা হয় এবং জাইগোট থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির মাধ্যমে স্পোরোফাইটের বৃদ্ধি হলে প্রোথ্যালাস শুকিয়ে যায়।

ফার্ন : টেরিডোফাইটা গ্রুপের Filicineae শ্রেণির উদ্ভিদসমূহকে সাধারণভাবে ফার্ন বলা হয়। ফার্ন স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদ। এদের দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা চলে। ফার্ন উদ্ভিদ অপুষ্পক কিন্তু ভাস্কুলার। ফার্ন উদ্ভিদের পাতা পক্ষল যৌগিক। ফার্নের পাতাকে ফ্রন্ড বলে। কচি পাতা কুণ্ডলিত অবস্থায় থাকে। ফার্নের গ্যামিটোফাইটকে প্রোথ্যালাস বলে। বাংলাদেশে বহু প্রজাতির ফার্ন আছে। তার মধ্যে বৃক্ষ ফার্ন অন্যতম। চট্টগ্রাম ও সিলেটের বনে বৃক্ষ ফার্ন পাওয়া যায়। সুন্দরবনে টাইগার ফার্ন পাওয়া যায়। অনেক ফার্ন শাক হিসেবে খাওয়া হয়।

এই অধ্যায়ে দক্ষতা অর্জন

১। ব্রায়োফাইট্স হলো অপুষ্পক, অবীজী, অভাস্কুলার বহুকোষী স্বভোজী উদ্ভিদ যাদের জননাঙ্গ বহুকোষী ও বন্ধ্যা কোষাবরণ দিয়ে আবৃত থাকে।
২। **টেরিডোফাইটস** হলো অপুষ্পক, অবীজী, ভাস্কুলার, স্বভোজী উদ্ভিদ।
৩। ব্রায়োফাইটস উভচর উদ্ভিদ কারণ স্থলজ ব্রায়োফাইটস-এর জীবনচক্রেও কোনো না কোনো পর্যায়েও পানির প্রয়োজন পড়ে।
৪। ব্রায়োফাইটস উদ্ভিদসমূহকে **হেপাটিকি, অ্যান্থোসিরোটি** এবং **মাসাই**–এ তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়।
৫। ব্রায়োফাইটের আদি বৈশিষ্টসমূহ হলো : এরা হ্যাপ্লয়েড, অধিকাংশই থ্যালয়েড, সত্যিকার মূলবিহীন, অভাস্কুলার এবং হোমোস্পোরাস।
৬। ব্রায়োফাইটের উন্নত বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো : অ্যান্থোসিরোটি শ্রেণির উদ্ভিদের ক্যাপসুলে কলুমেলার উপস্থিতি, স্টোমাটাযুক্ত এপিডার্মিস, ক্যাপসুলের গোড়ায় ভাজক টিস্যুর অবস্থান।
৭। বাংলাদেশ থেকে আবিষ্কৃত কয়েকটি *Riccia* প্রজাতির নাম হলো : *R.bengalensis, R.dhakensis, R. chittagonensis.*
৮। *Riccia* প্রজাতিসমূহের স্পোরোফাইট সর্বাপেক্ষা সরল, শুধুমাত্র গোলাকার ক্যাপসিউল নিয়ে গঠিত।
৯। *Riccia* উদ্ভিদের শুক্রাণু দ্বিফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট ও সচল এবং ডিম্বাণু নিশ্চল।
১০। টেরিডোফাইট অপুষ্পক এবং ভাস্কুলার, তাই এদেরকে **ভাস্কুলার ক্রিপ্টোগ্যামস্** বলা হয়।
১১। স্থলভাগে প্রথম প্রাধান্য বিস্তারকারী উদ্ভিদ হলো টেরিডোফাইট।
১২। সূর্যালোকময় স্থানে জন্মিতে পছন্দ করে বলে *Pteris*-কে **সানফার্ন** বলা হয়।
১৩। টেরিডোফাইট স্পোরোফাইটিক অর্থাৎ ডিপ্লয়েড। ব্রায়োফাইট গ্যামিটোফাইটিক অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড।
১৪। ফার্নের পাতাকে **ফ্রন্ড** বলে।
১৫। ফার্নের পাতা মুকুল অবস্থায় কুণ্ডলী পাকানো অবস্থায় থাকে যাকে **সারসিনেট ভার্নেশন** বলে।
১৬। ফার্নের কুণ্ডলিত কচি পাতাকে **ক্রোজিয়ার** বলে।
১৭। *Pteris* এর কাণ্ড **রাইজোম**জাতীয়।
১৮। *Pteris* এর কাণ্ডের ভাস্কুলার বান্ডল হ্যাড্রোসেন্ট্রিক, কারণ এর কেন্দ্রে জাইলেম ও চারদিকে ফ্লোয়েম থাকে।
১৯। *Pteris* এর ক্যাপসিউল **অ্যানুলাস, স্টোমিয়াম** এবং **বৃন্ত**–এ তিনটি অংশ দিয়ে গঠিত।
২০। *Pteris* উদ্ভিদের গ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ হলো স্পোর।
২১। *Pteris* তথা ফার্নের গ্যামিটোফাইট **হৃৎপিণ্ডাকার**, যাকে **প্রোথ্যালাস** বলা হয়।
২২। ফার্ন প্রোথ্যালাস স্বতন্ত্র, স্বভোজী ও বহুকোষী।
২৩। প্রোথ্যালাসের নিম্নতলে খাঁজের কাছাকাছি **আর্কিগোনিয়াম** ও নিচের দিকে রাইজয়েডের কাছাকাছি **অ্যান্থেরিডিয়াম** উৎপন্ন হয়।

২৪। ফার্ন প্রোথ্যালাস সহবাসী (পুং এবং স্ত্রীজননাঙ্গ একই প্রোথ্যালাসে থাকে।)
২৫। *Pteris* তথা ফার্ন-এর শুক্রাণু সচল ও **বহু ফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট**।
২৬। *Pteris* এর স্পোরাঞ্জিয়াম **ফল্‌স ইন্ডুসিয়াম** দিয়ে ঢাকা থাকে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। নিচের কোন উদ্ভিদের স্পোরোফাইট থ্যালাসে নিমজ্জিত থাকে ?
(ক) *Semibarbula* (খ) *Funaria* (গ) *Riccia* (ঘ) *Marchantia*

২। *Riccia*-এর বৈশিষ্ট্য হলো—
(i) দেহ গ্যামিটোফাইট ও থ্যালয়েড।
(ii) পরিবহণ টিস্যু আছে।
(iii) স্পোরোফাইট সরল এবং গ্যামিটোফাইটের ওপর নির্ভরশীল।
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
করিম সাহেবের বাগানের ভাঙ্গা দেয়ালে একটি গাছ দেখতে পেলেন যার পাতাগুলো যৌগিক এবং পিনার নিম্নতলে বসন্তের গুঁটির মতো উঁচু উঁচু দেখা যাচ্ছে। এ গাছের কোনো ফুল হয় না।

৩। উদ্দীপকের গাছটির আরো বৈশিষ্ট্য হলো —
(i) ভাস্কুলার টিস্যু আছে। (ii) কচি পাতা কুণ্ডলিত। (iii) ফল তৈরি করে।
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। পাতার পিনার নিম্নতলে বসন্তের গুঁটির মতো বস্তুগুলো কোন ধরনের প্রজননে অংশগ্রহণ করে ?
(ক) যৌন (খ) অযৌন (গ) অঙ্গজ (ঘ) কৃত্রিম

বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলির উত্তরমালা :

১। (গ)	২। (খ)	৩। (ক)	৪। (খ)

সৃজনশীল প্রশ্নের (CQ) নমুনা

১। উদ্দীপকটি পড়ো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
রহিম ভেজা মাটি থেকে একটি উদ্ভিদ 'A' এবং ভেজা দেয়াল থেকে একটি উদ্ভিদ 'B' তুলে এনে দেখলো, 'A' উদ্ভিদটির মূল, কাণ্ড নেই, থ্যালাস আছে কিন্তু 'B' উদ্ভিদটি মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত। উভয় উদ্ভিদে ফুল হয় না।
(ক) জনুঃক্রম কী ?
(খ) ফার্নের প্রোথ্যালাস সহবাসী কেন ?
(গ) উদ্দীপকের 'A' উদ্ভিদটির বৈশিষ্ট্য লেখ।
(ঘ) 'B' উদ্ভিদটি 'A' উদ্ভিদ থেকে উন্নত—ব্যাখ্যা করো।

২। পাশের চিত্রটি লক্ষ্য করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

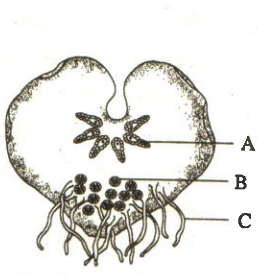

(ক) Liverwort কী?
(খ) ব্রায়োফাইটার (৪টি) বৈশিষ্ট্য লেখ।
(গ) চিত্রে A এর গঠন বর্ণনা করো।
(ঘ) A ও B চিহ্নিত অংশ (অঙ্গ) ব্যতীত ফার্নজাতীয় (Plant) উদ্ভিদের জনুঃক্রম অসম্ভব —উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো।